দুর্বার ভাবনা

বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ৪ □ অগাস্ট ২০১৩

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ... পরিবেশ কার বাপের সম্পত্তি ... স্মরজিৎ জানা...১
প্রচ্ছদ নিবন্ধ : উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়
বিজ্ঞানচেতনা ও বিজ্ঞান ... ... রুণা বসু ... ৪
উত্তরাখণ্ডে এই বিপর্যয় ! কত হাজার মরলে তবে মানবে ... কল্যাণ রুদ্র... ৫
প্রচ্ছদ নিবন্ধ : উত্তরবঙ্গের পরিবেশ
গঙ্গার পর তিস্তা ? উত্তরবঙ্গে পরিবেশ বিপর্যয়ের ... সৌমিত্র ঘোষ... ৭
আমার স্বদেশ আমার সময়
মিড-ডে মিল খেয়ে শিশুমৃত্যু : এই হননের দায় কার... তরুণ বসু ... ১০
বিশেষ নিবন্ধ : পশ্চিমবঙ্গের শিল্প
বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন, উন্নয়ন... সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ... ১১
বিশেষ নিবন্ধ : গ্রামোন্নয়ন
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রামোন্নয়ন ... ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় ... ১৫
বিশেষ নিবন্ধ : সামাজিক সুরক্ষা
যৌনকর্মী সহ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক... ... ভারতী দে ... ২৩
বিশেষ নিবন্ধ : ওষুধ
সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ও জীবনদায়ী ওষুধ চাই ... ২৫
অসুখ বিসুখ - রোগ বালাই
মধুমেহ... সিদ্ধার্থ গুপ্ত... ২৭
ঘটনা : বিশ্বে - দেশে - রাজ্যে - নগরে - গ্রামে
সোনি সোরি ঘরে ফেরে নাই ... ৩১

প্রচ্ছদ ছবির ঋণ স্বীকার : কল্যাণ রুদ্র। গুগলস ওয়েবসাইট।
প্রচ্ছদ : তরুণ বসু

মুদ্রণ : রে'জ ডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

DURBAR BHABNA
New Declaration No 1/12 & 2/12 as on 2. 1. 2012
Vol. 5 No.4 □ August 2013
Editor : Dr Smarajit Jana
Publisher : Bharati Dey
Address : 12/5 Nilmani Mitra Street, Kolkata 700 006
West Bengal, INDIA
Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777 e mail : sonagachi @sify.com URL : www.durbar.org

সম্পাদকীয়

পরিবেশ— কার বাপের সম্পত্তি

পরিবেশ— কার বাপের সম্পত্তি?

পরিবেশ নিয়ে বিগত দুটো দশক জুড়ে এ দেশে তথা বিশ্ব জুড়ে নানান আলোচনা, বিতর্ক, সামিট, সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে প্রায় লাগাতার ভাবে। এই সব আলোচনা ও সম্মিলনে নানান সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, অনেক প্রোটোকল তৈরি হয়েছে— পরিবেশ সংক্রান্ত বহু বিষয়কে ঘিরে। বিশ্ব উষ্ণায়ন, জীববৈচিত্র্য বজায় রাখা, বনায়ন ইত্যাদি নিয়ে প্রায় প্রতি বছরই বিশ্বের কোথাও না কোথাও আলোচনা চক্র এবং সামিট হচ্ছে। সেখানে শুধু আলোচনা বা বিতর্কতে সীমাবদ্ধ না থেকে কিছু সিদ্ধান্তে যাতে উপনীত হওয়া যায় সে চেষ্টা চলে। বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী বা সরকারি প্রতিনিধিরা সহমতে পৌঁছুলে প্রোটোকল সাক্ষরিত হয়। এই সব আলোচনা চক্র বা সম্মিলনে সরকারি প্রতিনিধিরা ছাড়াও পরিবেশ বিশারদ, মাঠ-কর্মী থেকে শুরু করে বহু ধরণের বিশেষজ্ঞ, শিল্পপতি এবং পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়ে থাকেন। তবে এই সব আলোচনায় যে বিষয়টা প্রায়শই উহ্য থাকে তা হলো, 'পরিবেশ রক্ষার মালিকানা' কার হাতে রয়েছে। মোদ্দা কথা হলো, পরিবেশ কার সম্পত্তি? যে মানুষজনেরা পরিবেশের কোলে বেঁচে রয়েছে, যারা প্রাকৃতিক আলো, বাতাস, নদী, নালা, বনজঙ্গল-কে নির্ভর করে দিন কাটায় তারা, না শিল্পপতি সরকারি আমলা, নাকি মন্ত্রী পরিষদ? কে এই পরিবেশের মালিক? এসব নিয়ে দু'একটা কনফারেন্সে স্বল্পবিস্তর আলোচনা যে হয়নি তা অবশ্য নয়। যে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে যে মানুষজনেরা রয়েছে তাদের মতামতকে অগ্রাধিকার দিতে কমবেশি দাবিও তোলা হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়নি তাই শেষবিচারে রাষ্ট্রপ্রধানরা কোন্ দিকে ঝুঁকছেন তার উপর দাঁড়িয়েই পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর নীতি নির্ধারণ হয়। পরিবেশ সংক্রান্ত কোন্ নীতি তৈরি করা হবে, বা হবে না, প্রোটোকল তৈরি হলেও তা লাগু করার

থেকে বিরত থাকা হবে, কি হবে না তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশের সরকাররা স্থির করেন।

পরিবেশ নিয়ে বিগত কয়েকটা দশক জুড়ে বিভিন্ন ধরণের গবেষণা এবং ওই সমস্ত গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে যে সব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে তা নিয়ে সারা বিশ্বে এখন আলোচনা ও বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তবে যত দিন যাচ্ছে এবং ক্রমশ যে বিষয়টা পরিষ্কার হচ্ছে তা হলো এই যে, পরিবেশজনিত বির্পযয়ের দায়ভার শুধু প্রকৃতি ও পরিবেশের খামখেয়ালিপনার উপর অর্থাৎ প্রকৃতির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে থেমে থাকা যাবে না কারণ তাতে সত্যের অপলাপ হবে। এটা এখন অনেক স্পষ্ট যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অনেকটাই মনুষ্যসৃষ্ট এবং দেশ-বিদেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-খরার পেছনে আপাত দৃষ্টিতে পরিবেশকে দায়ী করা গেলেও এর গভীরে রয়েছে মানুষের হাত। মানুষের কৃতকর্মের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব হিসেবে পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। বিংশ শতাব্দীতে আমরা দেশে দেশে দেখতে পাচ্ছি ঝড়, ঝঞ্ঝা, ঘুণার্বত বেড়েই চলেছে, বেড়ে চলেছে প্রকৃতির 'অস্বাভাবিক আচরণ'। একে শুধুমাত্র কাকতালীয় ব্যাপার বলে ভুলে থাকা যাবে না।

পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশে তা সে বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সব বড়ো ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে তা কিন্তু মানুষের কৃর্তকর্মের ফল। এ ধারা বজায় থাকলে, নিট ফল আগামী দিনে আমরা যে আরও ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে পা বাড়াব তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পৃথিবীর পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মানুষ তথা জীবজগৎকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে। কিন্তু দেশে দেশে উৎপাদন ও উন্নয়নের নামে যে একবগ্গা কর্মকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে— তা পৃথিবীর পরিবেশকে নানান ভাবে ক্ষতিসাধন করে যাচ্ছে। এই যে উন্নয়নের মডেল যা প্রকৃতিকে বিনষ্ট করে তৈরি হচ্ছে সে বিষয়টা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতা ও নেতৃবৃন্দরা যে একদমই বোঝেন না, তা কিন্তু নয়। আমেরিকার ২০০৪ সালের প্রেসিডেন্ট পদপার্থী আল গোরে প্রেসিডেন্টের পদে হেরে গেলেও পরবর্তীকালে পরিবেশবাদী হিসেবে নিজেকে বিশ্বজনমানসে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ইত্যাদি নিয়ে তিনি জনসাধারণকে সচেতন করার প্রভূত প্রয়াস নিয়েছেন, তবে তাতে নিজের দেশের রাষ্ট্রনেতারা কতটা প্রভাবিত হয়েছেন তা বলা মুশ্‌কিল। সে দেশে পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনকানুন এবং বিধিব্যবস্থা আজও তৈরি হয়নি, পরিবেশ বিনষ্ট করা উন্নয়নের মডেল সেখানে একই গতিতে আজও চলছে। আমাদের দেশেও অনেক নীতি নির্ধারক রয়েছেন যারা পরিবেশ বিষয়ে কম-বেশি জানেন এবং বোঝেন কিন্তু আমাদের দেশের চলতি উন্নয়নধর্মী কাজকর্মের ধারা ও মডেলে তার কোনো ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং বলা ভালো, এদেশের সরকার সচেতন ভাবেই প্রকৃতি, পরিবেশ বিনষ্ট করে যাচ্ছেন।

আর এ ভাবেই আমরা এগিয়ে চলেছি আরও বড়ো এক বিপদের দিকে। কারণ তাদের চোখে দেশের আশু লাভ-ক্ষতির হিসেবটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা সবসময়ই মনে করেন যে, নিজেদের গদি বজায় রাখতে গেলে দেশের উৎপাদন বাড়াতে হবে। আবার তারা এও বিশ্বাস করেন পাহাড়-জঙ্গল ধ্বংস না করলে সে উৎপাদনের ধারা বজায় রাখা যাবে না। এর যে কোনো বিকল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়া থাকতে পারে, তা তারা বিশ্বাসই করেন না। এছাড়া আমরা সবাই জানি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল অর্থমূল্য রয়েছে। গাছ কাটা, খনি থেকে খনিজ তুলে কারখানা গড়া বা রপ্তানি করা এক বড়ো মাপের ব্যবসা। এতে ব্যক্তিগত লাভ তো আছেই, সঙ্গে ভাই বেরাদরদের বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের ব্যবস্থাপনাও তৈরি করা যায় খুব সহজে। তবে অনেকেই হয়তো বলবেন এদেশের সব রাজনৈতিক নেতারাই আত্মসর্বস্ব নন। এদের অনেকেই দেশের প্রগতি ও উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামান। কথাটা হয়তো কিছুটা সত্যি হলেও হতে পারে। তবে তারা এই উন্নতি এবং প্রগতির শর্ত হিসেবে একটি বিশেষ ধারণা ও বিশ্বাসকে পুঁজি করে দেশের নিয়মনীতি, পরিকল্পনা, উন্নয়ন কর্মসূচি সহ সমস্ত বিষয়ে নীতি নির্ধারণে ব্রতী হন। তাদের কাছে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ঘটানো অর্থাৎ জিডিপি বাড়া, গ্রোথ রেট বাড়া প্রধান বিষয় এবং যেন-তেন প্রকারেণ তা বাড়াতে তারা বদ্ধপরিকর এবং সেটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারা মনে করেন তাহলেই নাকি দেশের মানুষদের কাজ পাওয়া, পুষ্টি, বেতন বাড়া, স্বাস্থ্য বজায় থাকা-সহ সব কিছুরই উন্নয়ন ঘটবে। এই ধারণা শুধুমাত্র তাদের মধ্যে আটকে থাকলে অন্য কথা ছিল। গরিব মানুষের উন্নয়ন ঘিরে শিক্ষিত মানুষজনদের অধিকাংশের মধ্যেই এরকম এক বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। আর তাতে ধূপ-ধুনো জুগিয়ে আসছেন দেশি-বিদেশি নামী-দামি বিভিন্ন অর্থনীতিবিদেরা। এ দেশের প্রধানমন্ত্রীর মতামতও এর থেকে ভিন্ন নয়। অসংগঠিত শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য অর্জুন সেন কমিটির সুপারিশ দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, 'সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি এ সব পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা। এসব নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করে দেশের উন্নয়ন (গ্রোথ রেট) কিভাবে বাড়বে সে বিষয়ে দৃষ্টি রেখে সুপারিশ করলে কাজের কাজ হতো।' তিনি ওই রিপোর্ট পড়ে যে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

আসলে এদেশের সরকার এবং বিরোধী মূল রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে মানুষের উন্নয়ন শুধুই অঙ্কের খেলা। সেখানে দেশের মানুষ, অসংগঠিত শ্রমিকরা কিভাবে জীবন কাটাবেন কিংবা তাদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলো গৌণ। মূল বিষয় হলো উন্নয়নের হার বৃদ্ধি। আর তারা মনে করেন যে, এই বৃদ্ধির হার যদি দ্রুতগতিতে বাড়ানো যায় তবে সেই উন্নয়নের রস নাকি চুঁইয়ে পড়বে গরিবদের ঘরে এবং তাতে গরিব মানুষদের উন্নয়ন এমনিই ঘটে যাবে, তাই এ নিয়ে মাথাব্যথার কোনো কারণ নেই, আর এটাই তাদের বদ্ধমূল ধারণা ও বিশ্বাস। সুতরাং অন্যেরা কি বলছেন সে ব্যাপারে দেশের নেতা নেতৃবৃন্দরা কোনো কথা শুনতে নারাজ। যে দেশে মানুষদেরই কোনো গুরুত্ব নেই সেখানে খামোকা পরিবেশ নিয়ে তারা যে চিন্তিত হবেন না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের আসল বিপদটা এখানেই। এই একমুখীন উন্নয়নের মতবাদ— যার উপর নির্ভর করে দেশের নিয়মনীতি তৈরি করছেন সরকারি নীতি নির্ধারণকারীরা তারা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকরা নানান দিক দিয়ে অনেক বেশি বলবান। এই মতের বিরোধীপক্ষের

Ú

লোকজনেরা যে নেই তা কিন্তু নয়। তারা অল্পবিস্তর এধার-ওধার ছড়িয়ে থাকলেও তুলনায় তারা স্বল্প এবং তাদের গলার এবং কলমের জোর কম। আর পড়ে থাকল দেশের আপামর জনসাধারণ। তারা থাকে এই সব আলোচনার গণ্ডির বাইরে। দেশের উন্নয়নের কুটকাচালি তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় বিতর্কে এই সব গরিব অসংগঠিত মানুষদের সংখ্যা ছাড়া তাদের আবছা ছবিও ধরা পড়ে না। সেখানে মানুষের মুখ নয়, সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব-নিকেশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, জিডিপি বাড়লে তাদের শরীরে শিহরন জাগে, বাজারে সেনসেক্সের পতন শুরু হলে তারা দুঃখে মুহ্যমান হন।

কেদারনাথে হাজার হাজার মানুষ মারা পড়লে দেশনেতারা হয়তো সামান্য কিছু কষ্ট পান তাই হয়তো গৃহহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে কমবেশি তৎপর হন। তাছাড়া সবারই জানা যে দুস্থ মানুষদের দান করে, পুনর্বাসন বিলিয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক ফায়দা তোলা যায়। দুস্থ গৃহহীন মানুষদের সেবা ইত্যাদি করে ভোটের বাজার মাত করা যায়। এই সব দিক মাথায় রেখে উন্নয়নের চলতি ধারাকে তারা লাগু রেখেছেন। সারা দেশে যথেচ্ছ ভাবে বনজঙ্গল কেটে, নদীনালা বুজিয়ে, বিশাল বিশাল বাঁধ দিয়ে নদী শাসনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন; বিদ্যুৎ তৈরির নামে বিপজ্জনক নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর বা পরমাণু চুল্লি বসিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন; পাহাড় কেটে জনবসতি তুলে দিয়ে নির্বিচারে খননকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন সারা দেশ জুড়ে। পরিবেশ ও প্রকৃতির সাধারণ নিয়মনীতিগুলোর তোয়াক্কা না করে এইসব কর্মকাণ্ড ঘটানোর বিষময় প্রতিক্রিয়া এখন ফলতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক কালে কেদারনাথের ঘটনা তার একটা উদাহরণ মাত্র। বনজঙ্গল-পাহাড় কেটে, নদী-নালা বুঁজিয়ে তীর্থযাত্রীদের জন্য হোটেল আবাসনের যে রমরমা কারবার খোলা হয়েছিল এবং যে ভাবে কেদারনাথের প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে, ট্যুরিজম ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফলতে শুরু করেছে। এ সবের ফলশ্রুতিতে যে বাঁধভাঙা বৃষ্টি আর সেই বৃষ্টি-বন্যার তোড়ে ভেসে গেল হাজার হাজার মানুষ, মারা গেল অজস্র শিশু ও মহিলা। তাই বলে এই ঘটনাটিকে স্রেফ প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত করা ভুল হবে। এই বিপর্যয় ঘটার পেছনের গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো এড়িয়ে যাওয়ার আবারও যে চেষ্টা হবে তা জানা কথা। কারণ এদেশের সরকার একই রাস্তায় হেঁটে চলবেন। এই সব রাজনীতির কলাকুশলীরা ফের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ আর একটা কেদারনাথ ঘটে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে যাবেন— বুঝে অথবা না বুঝে। প্রকৃতি বিনষ্ট করে, তার ভারসাম্য নষ্ট করে, উন্নয়ন ঘটনোর শর্ত বলে তারা মনে মনে বিশ্বাস করেন।

> □□ সারা দেশে যথেচ্ছ ভাবে বনজঙ্গল কেটে, নদীনালা বুজিয়ে, বিশাল বিশাল বাঁধ দিয়ে নদী শাসনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন; বিদ্যুৎ তৈরির নামে বিপজ্জনক নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর বা পরমাণু চুল্লি বসিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন; পাহাড় কেটে জনবসতি তুলে দিয়ে নির্বিচারে খননকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন সারা দেশ জুড়ে। পরিবেশ ও প্রকৃতির সাধারণ নিয়মনীতিগুলোর তোয়াক্কা না করে এই সব কর্মকাণ্ড ঘটানোর বিষময় প্রতিক্রিয়া এখন ফলতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক কালে কেদারনাথের ঘটনা তার একটা উদাহরণ মাত্র।

ইদানীং এদেশের উন্নয়নের রশিতে আরও জোরে টান পড়েছে, ফলে দেশের নীতি নির্ধারকেরা তাদের বিশ্বাস মতে উন্নয়ন ঘটানোর রাস্তায় স্টিমরোলার চালিয়ে যাওয়ার সমস্ত প্রক্রিয়া জোরদার করেছেন। এ ব্যপারে সাধারণ মানুষজনেরা কোথাও যদি সামান্য প্রতিরোধও গড়ে তোলার স্পর্দ্ধা দেখান তবে তাদেরকে হাতে-নাতে তার মূল্য গুণতে হবে। পুলিশ প্রশাসন লেলিয়ে দেওয়া হবে তাদের বিরুদ্ধে। বিরোধী মতবাদের লোকজনদের নির্বিচারে পোরা হবে জেলখানায়। প্রয়োজনে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তুলে এবং যত ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করা হবে, যেমনটা সরকার করেছেন তামিলনাড়ুর কুড়ানকুলামে, মহারাষ্ট্রের জইতাপুরে। ওড়িশায় পসকো-কে জায়গা করে দিতে, গরিব মানুষদের শুধু উচ্ছেদ নয় ধরপাকড়, লাঠিপেটা কিছুই বাদ থাকেনি। আর ছত্তীসগড়ের পুরো রাজ্য জুড়ে জ্বলছে উন্নয়নের উনুন। যেনতেন প্রকারেণ ওই রাজ্যের আদি মানুষগুলোকে মেরে-ধরে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। কারণ সেখানকার গরিব, কম লেখাপড়া জানা আদিবাসীরা বুঝতেই পারেন না, সরকার তাদের জন্য বা তাদের উন্নয়নের জন্য কতটা 'উদগ্রীব'!

রাজ্যে উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দিতে আদিবাসীদের ভিটে মাটি ছাড়া করে, বনজঙ্গল কেটে, পাহাড় মাটি খুঁড়ে খনিজ সম্পদ তুলতে সেখানে তারা ডেকে এনেছে পুঁজিপতিদের যারা শিল্প ও ব্যবসা গড়ে তুলবে। আর যারা নিজের বাপ দাদার ঘরবাড়ি, জমিজমা ছাড়তে আপত্তি করবেন তাদেরকে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে জেলখানায়। 'মাওবাদী' বলে বছরের পর বছর আটকে রাখা হচ্ছে জেলে। এটাই এদেশের গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি। যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনের কোনো গুরুত্ব নেই সেখানে পরিবেশ তো বহু দূরের কথা। যে মাটি, পাহাড়, জঙ্গল তাদের বাপ ঠাকুরদার সম্পত্তি বলে তারা জানতো, এক মুহূর্তে তা নস্যাৎ করে দেওয়া হলো সরকারি হুকুমে।

এদেশের গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে সম্ভবত সেটাই সম্ভব। জমি, জল আর জঙ্গলের পরিবেশে যারা মানুষ হয়েছেন এখন সেসব তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রকৃতি, পরিবেশ এ সব তো 'বেওয়ারিস মাল', এসবের মালিকানা যদি কারুর হয়েই থাকে তবে সে সব সরকারের বাপের সম্পত্তি না হয়ে যায় না।

স্মরজিৎ জানা

দু র্বা র ভা ব না অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৩ যুগ্মসংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে অক্টোবরের গোড়ায়।

বিজ্ঞানচেতনা ও বিজ্ঞান ...

রুণা বসু

ভারত তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। পরিব্রাজক রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১৯৪৮-এর জুনে সদ্য গঠিত রাজ্য হিমাচল প্রদেশের কিন্নর বা কনৌর ভ্রমণ করলেন। সে কাহিনি তিনি বিস্তারিত লিখেছেন তাঁর *কিন্নর দেশে* গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে হিমাচলের উন্নয়নের নানা প্রস্তাব তিনি রেখেছিলেন। বলেছেন একমাত্র বিজ্ঞানই পারে অনুন্নত হিমাচলের চেহারা বদলে দিতে। গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি লিখছেন : 'বার বার ধ্বস নামবে— বার-বার মেরামত করতে হবে ... মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত মানুষকেই করতে হবে। বছরের পর বছর ধরে বন-জঙ্গল কেটে সাফ করে দিয়েছে মানুষ— পাহাড়ের বনস্পতি প্রায় নেই বললেই হয়। গাছ না থাকলে, গাছের শিকড় না থাকলে— আলগা মাটি পাথর আটকে থাকবে কিসের টানে? ... ... এসব কথা আজ চিন্তা করা নিরর্থক। অতীতের ভুলের খেসারত দিতে হবে।'

প্রতীচী ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত রুণা বসু হিমাচলে কর্মরত। তাঁর কাছে উত্তরাখণ্ডের সাম্প্রতিক বিপর্যয় সম্পর্কে হিমাচলের মানুষের ভাবনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে এই লেখাটি পাঠিয়েছেন। — স ম্পা দ ক

বর্তমানে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে লিখতে হলে শুনতে হবে— বলুন তো এটা 'ম্যান মেড' না প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা। আমার মনে যে এ প্রশ্ন আসে না তা নয়, কিন্তু এটাও ভাবি, এই খামখেয়ালিপনার শিক্ষাও তো প্রকৃতি থেকে নেওয়া। প্রকৃতি নিজের তালে নিজেকে বদলায় আর মানুষ যুগ যুগ ধরে এই তাল-ছন্দের সন্ধান করছে। নতুন কিছু মনের মতো হলে সৃষ্টি, আর না হলে প্রলয়— এটাই পরম্পরার মানস চিত্র যেন।

উত্তরাখণ্ড আর হিমাচলে ঘটে যাওয়া দুর্যোগে সাধারণের অসুবিধের অন্ত নেই; শুধু এখানে কেন, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া প্রকৃতির খেলায় মানুষের অসহায়তা বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রাষ্ট্রে, যা বহু গবেষণার সম্মিলিত মেরুদণ্ড, তাকে মুখ থুবড়ে পড়া দেখলেই ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবেই, এটাই হওয়ার কথা।

বরং শোনা যাক, বিদ্যাসাগর নেগির কথা। তাঁর বয়স ৫৪ বছর। হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক, প্রায় সব কিছুকেই অতীতের চোখে দেখতে চান। তিনি বললেন—

কিন্নরে আগে সব জায়গায় বাড়ি বানানো হতো না। বাড়ির বয়স্করা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী দেখে নিতেন, কোথায় কোথায় পাহাড় ভেঙে পড়তে পারে আর হিমবাহ চলার রাস্তাই বা কোন্‌টা। পাহাড়ের চরিত্র সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ছিল অগাধ। শুধু তাই নয়, হিমবাহ চলার রাস্তায়, যেখানে যেখানে হাওয়ার প্রকোপ বেশি হতো, সেখানেও বাড়ি বা খেত কোনোটাই বানানোর সম্মতি দিতেন না। হাওয়ার তেজ এত বেশি যে, শুধু ঘরদোর নয়, বড়ো বড়ো গাছপালা পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়।

পাহাড়ে বাড়ি বানানোর ধারাও আলাদা ছিল। 'কাঠ-কুণি শৈলী' অনুযায়ী পাথরের উপর কাঠ বসিয়ে বাড়ির দেওয়াল বানানো হতো আর ছাদে কাঠের পাটাতনের উপর ভোজপত্র বা জুনিপার গাছের ছাল বিছিয়ে তার উপর মাটি দেওয়া হতো।

আবার যখন কোনো ব্যক্তির জায়গা ঠিক হবার পরও বাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে মনে সন্দেহ আসতো, তখন গ্রামদেবতা বা দুই তিন জায়গার মাটি নিয়ে অবশ্যই গুণিনের কাছে যেতেন। ওই মাটি আলাদা আলাদা থলিতে ভরে জ্যোতিষী গণনার মাধ্যমে ঠিক হতো কোন্ জায়গায় বাড়ি তৈরি বিপদমুক্ত হবে। বাড়ি বানানোর আগে অবশ্যই ভূমিপুজো করা হতো। বৌদ্ধ পরাম্পরা অনুযায়ী একটি ছোটো তামার ঘড়ায় সোনা, রুপো বা বিধান অনুযায়ী সামগ্রী রেখে ভিতের নীচে পোঁতা হতো।

লোকমুখে শোনা যায়, রামপুর ভূশহরের রাজা রামসিং, রামপুর প্রাসাদ বর্তমান স্থানে নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেবার আগে বড়োই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তখন ওঁর পরামর্শদাতারা কূলদেবীর পুজো পাঠ করার পরেও নির্মাণ স্থানে সারা রাত একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার পরামর্শ দেন। পরদিন সকালে ওই প্রদীপকে জ্বলতে দেখেই রাজা ওখানে প্রাসাদ নির্মাণ করবেন বলে মনস্থির করেন। আজও শতদ্রু নদীর ধারে এই প্রাসাদ সুরক্ষিত আছে।

কিন্তু বয়স্কদের এই সব ভাবনাকে আজ শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম কু-সংস্কার ভাবে। গ্রামে যেখানেই খালি জায়গা পায় সুবিধেমতো বাড়ি বা খেত বানিয়ে রোজগারের বন্দোবস্ত করে। এখন হিমবাহ বা পাহাড়ে পাথর গড়িয়ে পড়লে মানুষ পশু গাছপালা সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সাম্প্রতিকতম দুর্যোগে এইরকম অবুঝের মতো নির্মিত বাড়ি আর খেতের অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৭৪ সালে যখন কিন্নরে ভূমিকম্প হয়েছিল, কাঠ-পাথরের তৈরি বাড়ির ক্ষতি হলেও ভেঙে পড়েনি; কিন্তু ইট বালি সিমেন্টের তৈরি বহু বাড়ি ভেঙে পড়েছিল।

এখানকার জমির তিনটি ভাগ আছে। কিম-সারিং, রাং-সারিং, ঞু-সারিং। এই নামকরণ হয়েছে জমির উচ্চতা অনুযায়ী। গ্রামের আশপাশের জমিকে কিম-সারিং বলে, একবারে নীচের জমিকে ঞু-সারিং বলে আর পাহাড়ের মাথার জমিকে রাং-সারিং বলা হয়। এখানে কেউ বাড়ি বানায় না। গরমের সময় খেতের কাজ করার জন্যে আর পশু চরানোর জন্যে সাময়িক খামার ঘর বানায়। নীচের জমি ঞু-সারিংএও অস্থায়ী খামার বানানো হয়। এসব কথা সবার জানা থাকলেও বেশির ভাগই অশিক্ষিতের কথা বলে উড়িয়ে দেয় আর প্রাকৃতিক বিপর্যয় এলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বাড়তে থাকে।

কথার শেষে আমার মনে প্রশ্ন ওঠে, ঠিক কোন্ শিক্ষা বা ব্যবস্থা আমাদের সমকালীন হতে শেখাবে, আবার সমকালীন বিজ্ঞানটাই বা কি! □

উত্তরাখণ্ডে এই বিপর্যয় !

কত হাজার মরলে তবে মানবে তুমি শেষে

কল্যাণ রুদ্র

দেবতাত্মা হিমালয় কী ক্রুদ্ধ হন? নদীও কী প্রতিশোধ নেয়? এই বিপর্যয় কী প্রাকৃতিক? প্রাকৃতিক ভারসাম্যে গুরুতর বিঘ্ন ঘটেছে বলেই কী প্রকৃতি প্রতিশোধ নিল? নাকি আমাদের 'উন্নয়নে'র পরিকল্পনায় গলদ ছিল? বিপর্যস্ত দেবভূমি, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সহস্রাধিক মৃতদেহ আর আটকে থাকা বিপন্ন মানুষদের নিয়ে উদ্বেগের মাঝে এই সব নানা প্রশ্ন বাতাসে ভাসছে? 'প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তরও তো জানা'। চার বছর আগে সতর্ক করেছিল সিএজি-র রিপোর্ট; বলা ছিল ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে নবীন এই হিমালয়ে এত গাছ কেটে, টানেল তৈরি করে যে দুই শতাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলছে তা এক বড়ো বিপর্যয় ডেকে আনবে। ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ দপ্তর গোমুখ থেকে উত্তরকাশী পর্যন্ত গঙ্গার ১৩৫ কিমি গতিপথ ও অববাহিকাকে সংবেদনশীল বাস্তুতান্ত্রিক এলাকা বলে ঘোষণা করেছিল। অর্থাৎ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি (১৯৮৬) অনুসারে ওই এলাকায় আর কোনো নির্মাণ কাজ করা যাবে না। বধির কেন্দ্র বা উত্তরাখণ্ড সরকার শোনে নি। সেই আশঙ্কাই সত্যি হলো। নেতা/নেত্রীরা অবশ্য বসে নেই, হেলিকপ্টার থেকে বিধ্বস্ত চারধাম পর্যবেক্ষণ করে সব ধরণের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন; বিভিন্ন তীর্থযাত্রীদের উদ্ধারের কাজ শেষ হয়েছে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ করছেন সেনাবাহিনী। কিন্তু প্রশ্ন হলো সরকার কী এত মৃত্যুর দায় এড়াতে পারেন?

হিমালয়কে বলা হয় নবীন ভঙ্গিল শ্রেণির পর্বত যেখানে ভূগঠনের কাজ এখনও শেষ হয় নি। ভারতীয় প্লেট ও উত্তর ইউরো-এশীয় প্লেট মুখোমুখি হওয়া এবং তজ্জনিত প্রবল চাপের ফলে মধ্যবর্তী শিলাস্তরে ভাঁজ পড়ে হিমালয়ের জন্ম। ভূতাত্ত্বিকরা বলেন ভারতীয় পাত ধীরে ধীরে ইউরো-এশীয় পাতের নীচে ঢুকে যাচ্ছে এবং শিলাস্তরে অসংখ্য বিলোম চ্যুতি তৈরি হচ্ছে। ভূ-অভ্যন্তরে জমতে থাকা তাপ একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে ভূত্বকে চাপ দেয় এবং কোনো দুর্বল স্থান দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়; হিমালয়ের শিলাস্তরের চ্যুতি এই তাপ-শক্তি বেরিয়ে আসার সহজ পথ। এই কারণেই হিমালয় এত ভূমিকম্প প্রবণ ও অস্থির।

এই বিপর্যয়ের প্রাথমিক কারণ অবশ্যই প্রাকৃতিক; এবার মৌসুমি বায়ু অন্তত দুই সপ্তাহ আগে উত্তরাখণ্ডে পৌঁছে গিয়েছিল যা সর্বকালীন রেকর্ড; এর আগে মৌসুমি বায়ুর দ্রুত অগ্রসর হওয়ার এমন ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬১ সালের ২১ জুন। যে মৌসুমি বায়ু গাড়োয়ালে হিমালয়ে পৌঁছানোর কথা ১ জুলাই তা ১৪-১৫ জুন এসে যাওয়ার ফলে দ্রুত ঘনীভূত হয়ে প্রবল বৃষ্টি ঘটিয়েছিল। মনে রাখতে হবে দুই সপ্তাহ আগে হিমালয় আপেক্ষিক ভাবে শীতলতর ছিল বলেই জলীয় বাষ্প দ্রুত ঘনীভূত হয়েছিল। টিআরএমএম স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে মার্কিন গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, ১১-১৭ জুনের মধ্যে মন্দাকিনী, ভাগীরথী ও অলকানন্দা অববাহিকায় ৫০৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল, ওই সংস্থা আরও জানিয়েছে ১৩-১৯ জুনের মধ্যে উত্তরাখণ্ডে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তা স্বাভাবিকের তুলনায় ৮৪৭ শতাংশ বেশি। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে ১৬ ও ১৭ জুন ২৪ ঘণ্টায় দেরাদুনে ৩৭০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল; এই বৃষ্টি বর্ষার চার মাসের গড় বৃষ্টির ৩০ শতাংশ। এমন আকাশভাঙা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া ছিল ইন্টার গভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর চতুর্থ প্রতিবেদনে। ২০০৭ সালের সেই রিপোর্টে বলা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে অল্প সময়ের মধ্যে অতিবৃষ্টি বা 'স্টর্ম-রেনফলের' প্রবণতা বাড়বে। একই সঙ্গে বাড়বে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়। ২০০৯ এর মে মাসে এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় লন্ডভন্ড করে দিয়েছিল সুন্দরবনের জীবন-জীবিকা। এই ক্ষতচিহ্ন আজও শুকোয় নি; উত্তরাখণ্ড কবে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে তা কেউ জানে না।

এপ্রিল মাস থেকে হিমালয়ের ঢালে শীতকালে জমা তুষার গলতে থাকে এবং জুন মাসে ঢালের উপরের বোল্ডার, কাঁকর, বালি, পাথর পিচ্ছিল হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে প্রবল বৃষ্টি হলে ধ্বস অনিবার্য। কেদারের মন্দির থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার উজানে মন্দাকিনীর উৎস এক হিমবাহ গলা হ্রদ থেকে, যার নাম গান্ধী সরোবর বা চোরাবারি তাল। ওই এলাকাটি হিমবাহ বাহিত বোল্ডার ও পাথরে ঢাকা। ১৬ জুন কেদারডোম শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা বিপুল পরিমাণ পাথরের স্রোত চোরাবারি তালকে ঘিরে থাকা টার্মিনাল মোরেন বা প্রাচীরকে ভেঙে ফেলেছিল; তারপর প্রবল গতিতে নেমে জল-বোল্ডার-পাথরের স্রোত কেদার থেকে

□□ ভক্তরা যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন, কেদারের মন্দির কোনো অলৌকিক কারণে রক্ষা পায় নি; নির্মাতারা অসাধারণ দক্ষতায় মন্দির নির্মাণের জন্য যে স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন তা ভৌগোলিক কারণেই স্থিতিশীল। মন্দিরটি মন্দাকিনীর দু'টি ধারার মাঝে অবস্থিত। জল- পাথরের স্রোত ওই দুই খাত ধরেই নেমেছিল আর মন্দির সেই কারণেই অক্ষত থেকে গেছে; আরও বলা প্রয়োজন, ওই দুই নদীর প্লাবনভূমির যে সব অংশ দখল করে হোটেল/ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল তা ভেঙেচুরে সাফ হয়ে গেছে।

গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত এলাকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভক্তরা যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন, কেদারের মন্দির কোনো অলৌকিক কারণে রক্ষা পায় নি; নির্মাতারা অসাধারণ দক্ষতায় মন্দির নির্মাণের জন্য যে স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন তা ভৌগোলিক কারণেই স্থিতিশীল। মন্দিরটি মন্দাকিনীর দু'টি ধারার মাঝে অবস্থিত। জল-পাথরের স্রোত ওই দুই খাত ধরেই নেমেছিল আর মন্দির সেই কারণেই অক্ষত থেকে গেছে; আরও বলা প্রয়োজন, ওই দুই নদীর প্লাবনভূমির যে সব অংশ দখল করে হোটেল/ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল তা ভেঙেচুরে সাফ হয়ে গেছে।

একই ধরণের কাণ্ড ঘটিয়েছিল গোমুখ থেকে নেমে আসা ভাগীরথী যার তাণ্ডবে বিপর্যস্ত গঙ্গোত্রী, উত্তরকাশী, দেবপ্রয়াগ সহ বহু বসতি। বদ্রিনাথ ও গোবিন্দঘাটকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল অলকানন্দা ও তার উপনদী লক্ষণগঙ্গার মিলিত প্লাবন। তবু বলব এত বড়ো বিপর্যয় হওয়ার কথা নয়। গত কয়েক দশক ধরেই গাড়োয়াল হিমালয়ে ভূমি ব্যবহারের কোনো নীতি-নিয়মই মানা হয় নি। পাহাড়ের ঢাল কেটে কংক্রিটের বাড়ি, নদীর প্লাবন ভূমিতে হোটেল, রিসর্ট বা প্রায় নদীর খাতের ভিতরেই মন্দির বা আকাশছোঁয়া শিবমূর্তি— কী হয়নি! এমনকী গঙ্গোত্রীর বর্তমান মন্দিরটিও নদীর প্লাবনভূমিতেই অবস্থিত। এছাড়াও আছে বিপুল সংখ্যক পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান চাপ। নদী স্বাভাবিক বর্ষার সময় যতটা প্রশস্ত হয় তার বাইরেও কিছুটা স্থান থাকে যার নাম প্লাবনভূমি। কোনো কোনো বছর অতিবর্ষার সময় নদী এই প্লাবনভূমিকে ডুবিয়ে দেয়। এই ধরণের প্লাবন প্রতি বছর না হলেও ওই স্থান নদীর জন্যই ছেড়ে রাখতে হয়। ২০০৯ সালে সাতজন আইআইটি-র অধ্যাপক ও অন্যান্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গঠিত ন্যাশনাল গঙ্গা রিভার বেসিন অথরিটি তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্ট-এ গঙ্গায় অবিরল ও নির্মল ধারা বজায় রাখতে বলেছেন, একই সঙ্গে তাঁরা নদীর প্লাবনভূমিকে যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত রাখতে বলেছেন। মানুষ প্লাবনভূমি দখল করলে নদী একদিন তা আবার কেড়ে নেয়— উত্তরাখণ্ডের এই প্লাবন সেই শিক্ষাই দিয়ে গেল।

উত্তরাখণ্ডের এই বিপর্যয়কে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এই সময় নির্মীয়মান দুই শতাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবেশের সব বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বহু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, পাহাড়ের ঢালে ব্লাস্টিং করে টানেল তৈরি করা হয়েছে, সর্বোপরি নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে নির্মিত হয়েছে বিশাল বাঁধ ও জলাধার। এই সব কর্মকাণ্ড অস্থির হিমাচলের ঢালকে আরও ভঙ্গুর করেছে এবং নদীর ঢালকে বদলে দিয়েছে; বাঁধ উপচে আসা স্রোত জলপ্রপাতের মতো নেমে আসে এবং সেই স্রোতের ধ্বংসের ক্ষমতা অনেক বেশি।

□□ উত্তরাখণ্ডের এই বিপর্যয়কে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এই সময় নির্মীয়মান দুই শতাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবেশের সব বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বহু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, পাহাড়ের ঢালে ব্লাস্টিং করে টানেল তৈরি করা হয়েছে, সর্বোপরি নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে নির্মিত হয়েছে বিশাল বাঁধ ও জলাধার। এই সব কর্মকাণ্ড অস্থির হিমাচলের ঢালকে আরও ভঙ্গুর করেছে এবং নদীর ঢালকে বদলে দিয়েছে; বাঁধ উপচে আসা স্রোত জলপ্রপাতের মতো নেমে আসে এবং সেই স্রোতের ধ্বংসের ক্ষমতা অনেক বেশি।

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে— এই বিপর্যয় ঘটল বর্ষার শুরুতে, নেমে আসা ধ্বসের কাঁকর, বালি, পাথরের অনেকটাই এখনও পাহাড়ের ঢালে আটকে আছে। আগামী তিন মাসে বৃষ্টির সময় ওই পাথর ক্রমাগত গড়াবে, আরও বিপন্ন করবে জনজীবন, রুদ্ধ করবে নদীর খাত, বিশেষ করে যেখানে বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে।

গঙ্গা বহমান জল ও পলির স্রোত এবং নানা প্রজতির আশ্রয় স্থল; এই বহমান ধারা দূষিত বা প্রতিহত হলে নানা প্রাণী বিপন্ন ও লুপ্ত হয়, যেমন হারিয়ে যাচ্ছে ডলফিন বা বাঙালির অতিপ্রিয় ইলিশ। উত্তরবঙ্গের নদীতে বোরোলি মাছের সংখ্যাও কমছে। বিশেষজ্ঞ কমিটি বলেছে নদীর অবিরল ও নির্মল ধারাই বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে এবং তাতেই মানুষের বৃহত্তর মঙ্গল। কিন্তু এই পরামর্শ সরকার শুনবে কী? উত্তরাখণ্ড বা কেন্দ্রীয় সরকার এই বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেবে কী?

আরও বড়ো প্রশ্ন— আমাদের উত্তরবঙ্গ বা উত্তরপূর্ব ভারত এই মুহূর্তে কতটা নিরাপদ? এখানে আরও বড়ো বিপর্যয় হতে পারে কারণ পূর্ব হিমালয়ে গাড়োয়ালের তুলনায় দ্বিগুণ বৃষ্টি হয় এবং এখানে পাহাড় আরও ভঙ্গুর। তিস্তার উজানে ২২টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলছে; অরুণাচলে ১৫৭টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। দার্জিলিং থেকে গ্যাংটক সর্বত্র এখন কংক্রিটের কাঠামো! হিমালয়ের ঢাল কেটে অবৈধ ভাবে চুনাপাথর নিষ্কাশনের ফলে পাথরের নীচে চাপা পড়েছে জয়ন্তী নদী। পলি জমে ধারণ ক্ষমতা দ্রুত হারাচ্ছে সব নদী। বলা যায় আমরা এক আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে আছি।

এই বিশ্বায়নের সময় সরকারের নীতি নির্ধারিত হয় মুষ্টিমেয় মানুষের মুনাফা ও ভোগের লক্ষ্যে। প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্য,দেশের বৃহত্তর মানুষের মঙ্গল, আগামী প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা— এসব এখন গৌণ। আমরা শুধু অসহায় প্রশ্ন করতে পারি :

'কত হাজার মরলে পরে মানবে তুমি শেষে
বড্ড বেশি মানুষ গেছে বানের জলে ভেসে'! □

গঙ্গার পর তিস্তা?

উত্তরবঙ্গে পরিবেশ বিপর্যয়ের সঙ্কেত

সৌমিত্র ঘোষ

হিমালয়ে বিপর্যয় : প্রকৃতি বনাম সরকার

উত্তরাখণ্ডে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের ক্ষত এখনও দগদগে— ধ্বসে পড়া ভাঙা পাহাড়ে আবার ধ্বস নামছে, রাস্তার চিহ্ন নেই বহু জায়গায়, পাথর-কাদার স্তূপে আটকে আছে মৃতদেহ। বৃষ্টি চলছে গোটা হিমালয়ে, উত্তরাখণ্ডের পাশে হিমাচলে, আমাদের ঘরের কাছে দার্জিলিং পাহাড়ে, সিকিমে, একটু দূরের অরুণাচলে। কবে এ সব অঞ্চলে অতি বৃষ্টি কি মেঘ ফাটা বৃষ্টিতে বান ডাকবে, কবে উন্মত্ত জলকল্লোল ভাসিয়ে গুঁড়িয়ে দেবে গ্রামশহর, থকথকে কাদা হয়ে নেমে আসবে পর্বত, তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। ঠিক যে যে কারণে অলকানন্দা-মন্দাকিনী-ভাগীরথী উপত্যকায় বান এসেছে, সেই সেই কারণ এখানেও একই ভাবে মজুত। বাকিটা তাঁর, মানে জগদীশ্বরের ইচ্ছা। আমাদের দেশে এটাই দস্তুর— অনেক ক্ষয়ক্ষতি না হলে, বিস্তর মানুষ বেঘোরে না মরলে সরকারের ঘুম ভাঙে না। অবিশ্যি জাগ্রত সরকার আর ঘুমন্ত সরকারের মধ্যে কে বেশি বিপজ্জনক, তা নির্ণয় করাটাও মুশকিল।

এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই, উত্তরাখণ্ড সহ হিমালয় পাহাড়ের সর্বত্র এই যে বিপর্যয় পরিস্থিতি বা ডিসাস্টার সিচুয়েশান তার পিছনে সরকারি অপ-পরিকল্পনার এবং সক্রিয়তার অবদান প্রচুর। গত তিরিশ বছর ধরে পাহাড়ি মানুষ এবং শহুরে পরিবেশবাদীরা রাস্তায় নেমে মিছিল করে, মামলা মোকদ্দমা করে, জেলে গিয়ে, পুলিশের লাঠি খেয়ে, অনশন করে, জলে ডুবে বলার চেষ্টা করেছেন যে, পাহাড়ে, বিশেষ হিমালয় পাহাড়ে, দমাদ্দম ডিনামাইট ফাটিয়ে, হলুদ রঙের বড়ো বড়ো মাটিকাটা মেশিন এনে রাস্তা করে, পাহাড় এঁফোড় ওফোঁড় করে যথেচ্ছ সুড়ঙ্গ খুঁড়ে, যেখানে সেখানে মর্জিমাফিক নদীর গতিপথ আটকে বাঁধ বানালে কাজের কাজ কিছু হবে না, উল্টে পাহাড় আর পাহাড়ি প্রকৃতির বারোটা বাজবে। কে কার কথা শোনে— সরকারি উন্নয়ন প্রক্রিয়া সতত অপ্রতিরোধ্য ও অমোঘ। এবং সরকার ঠিক করেছেন, দেশে ৮ লাখ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতেই হবে, যে কোনো হালতে। সুতরাং পাহাড় ভাঙো, নদীতে বাঁধ লাগাও, ঠিকাদার ডাকো, পিপিপি কায়দায় (বিশ্ব ব্যাংক উবাচ— এর অর্থ জল জঙ্গল জমি আদি প্রাকৃতিক সম্পদ নিষ্কর— বা নামমাত্র করে— নানা কোম্পানিকে বন্দোবস্ত করে দাও, যাতে তা বেচে তারা মুনাফা করতে পারে) প্রকল্প করো যাতে উরজা কি উজালা হয়, অর্থাৎ দেশের অন্ধকার ঘুচে বিদ্যুতের রোশনাই-এ ভূপ্রকৃতি মোহময়ী হয়ে ওঠে।

গোদের উপর বিষফোঁড়া : বাঁধ, উষ্ণায়ন ও জলবায়ু বদল

সুতরাং বাঁধ, আরও বাঁধ, আরও বাঁধ। এক একটা পাহাড়ি নদীর একশো কিলোমিটার গতিপথে ৬টা থেকে ১০টা বাঁধ উঠছে। আর উঠছে এমন একটা সময়ে যখন সারা পৃথিবীর আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন, পৃথিবী গরম হয়ে ওঠার কারণে। পৃথিবী গরম হচ্ছে কেন তা আজ মোটামুটি সবার জানা— শিল্পসভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে এবং উন্নত হবার জন্য ধনী দেশগুলো এত কয়লা আর পেট্রোলিয়ম পুড়িয়েছে যে, তেল পোড়ানো কার্বন ধোঁয়া গিয়ে জমা হয়েছে বায়ুস্তরে। ঠিক যে ভাবে প্লাস্টিকের চাদর কি কাঁচ দিয়ে গ্রিন হাউস তৈরি করে উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলের গাছপালা পোষা হয়, ঠিক সে ভাবে পৃথিবীর উপর আজ কার্বন ধোঁয়ার চাদর, সূর্যের তাপ মাটিতে আটকা পড়ে যাচ্ছে। এতে করে বদলে যাচ্ছে এই গ্রহের জলবায়ু— বিশেষ করে যেটাকে বলা হয় বর্ষাচক্র বা মনসুন সাইক্লু, ভারতে তা তছনছ হয়ে গেছে। এর মানে এই যে, কবে কখন কতটা বৃষ্টি হবে তা আগে থেকে বলা প্রায় যাবেই না— অতিবৃষ্টি আর মেঘ ফাটা বৃষ্টি ঘটতে পারে যত্রতত্র, যখন তখন।

তিস্তায় বাঁধ— বিপর্যস্ত দার্জিলিং হিমালয়

খেয়ালি বর্ষাচক্র, একের পর এক নদীবাঁধ, তজ্জনিত নির্মাণ, পাহাড়ে উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশের নামে আরও নির্মাণ— স্থানীয় মানুষের বাঁশ-কাঠ-পাথরের কুটিরকোঠা নয়, কংক্রিট। ফল যা হবার তাই, প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে দেখা দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গের দিকটার তিস্তা নদী উপত্যকায় (নদীর অনেকটাই সিকিমে) সেভক করোনেশান সেতু বা বাঘপুল থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত মোটামুটি ২৫ কিলোমিটার এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা এনএইচপিসি-র দুটি বাঁধ-কেন্দ্রিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শেষের মুখে, রাজ্য সরকারের সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বিলি কোম্পানির আরও দুটি প্রকল্প প্রস্তাবিত। সেভক থেকে কয়েক কিলোমিটার ভাঁটিতে গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ। বাঁধ বা তজ্জনিত

নির্মাণ কাজ শুরু হবার আগে থেকেই কালিমপং কি সিকিম যাবার রাস্তার আশেপাশের পাহাড় ছিল ভঙ্গুর, ধ্বস নামাটা এখানে যে প্রতি বর্ষায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, জন্মইস্তক এলাকার মানুষ তা দেখে আসছেন। বাঁধ দেবার পর, অর্থাৎ পাহাড় ফাটিয়ে নির্মাণ শুরু হবার পর থেকেই ধ্বসের ঘটনা বেড়ে গেছে বহুগুণ। কালিঝোরায় এনএইচপিসি-র প্রথম বাঁধ, অর্থাৎ তিস্তা নীচু বাঁধ প্রকল্প-৪ থেকে দ্বিতীয় বাঁধ, অর্থাৎ ২৭ মাইলে তিস্তা নীচু বাঁধ প্রকল্প-৩ পর্যন্ত রাস্তায় অন্তত ১৬টা ধ্বস, যার ১০টা নতুন, ২০০৪-এ বাঁধ বানানো শুরু হবার পর থেকে হওয়া। একাধিক জায়গায়, পুরো পাহাড় ধ্বসে নেমে আসছে, নীচ থেকে পাথরের দেয়াল তুলে কোনো ক্রমে তা ঠেকানোর চেষ্টা চলছে, যেমন তিস্তা নীচু বাঁধ প্রকল্প-৩-এর ঠিক সামনের পাহাড়টায়। বাঁধের আশেপাশের খাড়া পাহাড়ে যে গ্রামগুলো আছে, যথা ২৭ মাইলের উপরে দেওরালি, কি কালিঝোরার ঠিক উপরে কারমাট, সেখানেও বাঁধ বানানো আর রাস্তা চওড়া করার জন্য ডিনামাইট ফাটানোয় ঘরের দেয়াল ফাটছে, পাহাড়ে নতুন করে ফাটল ধরছে।

২৭ মাইল থেকে তিস্তা নীচু বাঁধ প্রকল্প-৩-এর জন্য তিস্তা অবরুদ্ধ, যে জলাধার তৈরি হয়েছে তাতে এই বৃষ্টিতে জলের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে, ২৯ মাইল বস্তির নীচেই ধাক্কা মারছে জল, যে কোনো দিন ২৯ মাইল আর তার পরের গেইলখোলা বস্তি সমেত জাতীয় সড়ক ৩১-এ নদীতে চলে যাবে। মিলিটারি কর্তারা, যাঁরা এই রাস্তাটার দেখভাল করেন, ঠিক করেই ফেলেছেন রাস্তা থাকবে না, ২৭ মাইল থেকে তিস্তাবাজরের আগে অবধি পাহাড়ের মাথা দিয়ে নতুন সড়ক বানানোর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ, পর্যটন শিল্প কি দেশের নিরাপত্তা-কাজে বিঘ্ন ঘটবে না।

বিপন্ন মানুষ—
কয়েক হাজার পরিবার বিপর্যয়ের মুখে

মুশকিলটা ওই রাস্তায় বাস করা, রাস্তায় দোকান চালিয়ে কি অন্য কাজ করে বেঁচে থাকা মানুষদের, নদীর দু'পাশে পাহাড়ে থাকা মানুষদের। এক ২৭ মাইল থেকে তিস্তাবাজার অবধি রাস্তায় বাড়ি করে আছেনই প্রায় ৩৫০ পরিবার, ২৭ মাইল বাঁধের নীচেই আছে রিয়াং বস্তি, সেখানে আরও ৮০টি। সেভক থেকে কালিঝোরা হয়ে তিস্তাবাজার মল্লি রংপো পর্যন্ত রাস্তার ধারে ও দু'পাশের পাহাড়ে

> □□ স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, উল্টে কালিমপং এসডিও দপ্তর থেকে এক অফিসার এসে ১৫টি নদী-তীরবর্তী দোকান বন্ধের আদেশ দিয়ে গেছেন, আরও বলেছেন, মিলিটারির জমিতে বসে থাকা চলবে না। বোঝাই যাচ্ছে, প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন কি ক্ষতিপূরণের ববস্থা করতে কেউ-ই তৈরি নন, না জেলা প্রশাসন না এনএইচপিসি, তাঁরা চাইছেন লোকজন জায়গাখালি করে এমনি এমনিই উঠে যাক। উঠে যাক নাহলে ভেসে যাক। সাধারণ মানুষের জীবনের কি দাম? কি দাম পাহাড়ের, পাহাড়ি পরিবেশের?

আছেন বেশ কয়েক হাজার পরিবার। বেশি বৃষ্টি হলে, ২৭ মাইল জলাধারের জল বাড়লে, যে কোনো দিন এই মানুষেরা পাহাড়চাপা পড়ে মরবেন, বা ভেসে যাবেন। তিস্তা নীচু বাঁধ প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ হবে, ঠিকাদার-রাজনীতিক- কোম্পানিকর্তা-দালাল অধ্যুষিত দেশের তরক্কি হবে। এই মানুষদের কি হবে? কি হবে পাহাড় আর নদীখাতের ঘন জঙ্গলের বাসিন্দা পশুপাখি উদ্ভিদের?

বে-আইনের নানারকম—
তিস্তায় এনএইচপিসি-র যথেচ্ছাচার

এ সব প্রশ্নে কেউ যেতে রাজি নন, না এনএইচপিসি কর্তারা, না রাজ্য সরকার, না রাজনীতিকরা। দীর্ঘদিন পাহাড়-জঙ্গলের মানুষের সঙ্গে কাজের সুবাদে এই লেখক ও তার বন্ধুরা গত ১০ বছরে তিস্তা নীচু বাঁধ প্রকল্প নিয়ে আর উজানি তিস্তায় বাঁধ দেওয়া নিয়ে গলা ফাটিয়েছে, ২০০২ সালে যে সময় এই প্রকল্পের পরিবেশ সমীক্ষা বা ইআইএ হয় সেই সময় থেকে। দেশের, রাজ্যের, উত্তরবঙ্গের বহু সংগঠন, বহু মানুষ এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে যে জনশুনানি হয়, তাতে অংশ নিয়েও এসব আপত্তি নিয়মামাফিক নথিবদ্ধ করানো হয়। তিস্তা নীচু বাঁধ প্রকল্প-৩ ও -৪-এর ইআইএ প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখানো হয়, বাঁধগুলি তৈরি হচ্ছে ভূমিকম্পপ্রবণ ভঙ্গুর পাহাড়ে, যেখানে এ জাতীয় বড়ো নির্মাণ-কাজ ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনতে পারে, পাহাড় ফাটানো ও রাস্তা নির্মাণে বাড়তে পারে ধ্বসের বিপদ, পুরোনো ঘুমন্ত ধ্বস আবার জেগে উঠতে পারে, সৃষ্টি হতে পারে নতুন ধ্বসেরও। এই ইআইএ-র অংশ হিসেবে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজটি করেন ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চল শাখা, তাদের প্রতিবেদনে ধ্বসের বিপদ নিয়ে বিস্তারিত বলা হয়। ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদনটি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বাঁধ বানানো নিয়েও সতর্কবাণী দেয়, আর বলে যে নদীতে বাঁধ দিয়ে যে জলাধার নির্মাণ হবে তারা দু'পাশের পাহাড়কে আরও নড়বড়ে করে তুলবে, কেননা জমা জল দীর্ঘদিন ধরে মাটির ছিদ্র দিয়ে ছিদ্রবহুল (porous) পাহাড়ি ঢালের মধ্যে চারিয়ে যবে। ২০০২ সালে ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের কাছে তিস্তা নীচু বাঁধ প্রকল্পের পরিবেশ ছাড়পত্র চাইবার সময়, এই সমীক্ষাটি এনএইচপিসি বেমালুম চেপে গিয়েছিল। এ নিয়ে প্রচুর চেঁচামেচি হবার পর, ২০০৪-এ তিস্তা নীচু বাঁধ প্রকল্প-৪-এর জন্য শুনানি-র আগে ইআইএ প্রতিবেদনে এটা তারা জুড়তে বাধ্য হয়।

বে-আইনে রাজনৈতিক মদত

তিস্তা নীচু বাঁধ প্রকল্পের দু'টি জন শুনানিতেই বর্তমান লেখক উপস্থিত ছিলেন—২০০৩-এর জানুয়ারিতে দেওরালি বস্তিতে প্রকল্প ৩-এর, ২০০৪-এর সেপ্টেম্বরে কালিঝোরায় প্রকল্প ৪-এর। দু'টিতেই বাইরের লোক অর্থাৎ প্রকল্প এলাকার বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছিল—সংগঠিত যৌথ উদ্যোগে এ কাজ করেন এনএইচপিসি ও তৎকালীন শাসক দল। ওই দলের বিজ্ঞান সংগঠনের লোকজন হাজির থেকে বাঁধ বানালে যে পরিবেশের রমরমা সে বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। এই দ্বিমুখী চাপ ত্রিমুখী হয় যখন গোর্খা হিল কাউন্সিলের তিস্তাবাজার এলাকার সভাসদ স্বয়ং ২৯ মাইল গেইলখোলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখান, বাঁধ বিরোধী বক্তব্য রাখা চলবে না। পয়সা ও ঠিকা ছড়িয়ে প্রভাবিত করা হয় কালিঝোরা বাজারের গরিব মানুষদের। ফলত, এনএইচপিসির বেপরোয়া বেআইনি কাজ আর দুর্নীতি চাপা পড়ে যায়। শাসক বদলায়, কিন্তু শাসন এক থাকে— পাহাড়ের বর্তমান শাসকেরা বাঁধ বিরোধী একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি, এবং

বর্তমান রাজ্য সরকার দু'বছরে তিস্তায় আরও দু'টি বাঁধের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন।

খাদের কিনারায় ২৯ মাইল, গেইলখোলা

এই লেখাটা যখন তৈরি হচ্ছে, ২৯ মাইল বস্তির তলায় এনএইচপিসি-র দেওয়া নদী বরাবর দেয়াল (পোশাকি নাম, 'গার্ড ওয়াল', ইআইএ প্রতিবেদনের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বা ইএমপি-তে বলা হয়েছিল ২৭ মাইল থেকে আরম্ভ হয়ে গোটা জলাধারের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি ঢালে ৭ কিলোমিটার লম্বা এই 'গার্ড ওয়াল' তোলা হবে, এতে নাকি জলের চাপ আটকানো যাবে, পাহাড় ধ্বসবে না, নদী ভাঙন হবে না) ধ্বসে পড়ে গেছে। প্রসঙ্গত বলা ভালো, এই ফঙ্গবেনে দেয়াল আছে মাত্র মোট কয়েকশো মিটারে, ৭ কিলোমিটার তো দূরস্থান, এবং জলাধারের শেষ সীমা তিস্তাবাজার সেতু ছাড়িয়ে আরও উজানে পৌঁছেছে। জুন মাসের ৩০ তারিখে যখন গার্ড ওয়ালে ফাটল ধরে, এনএইচপিসি-র লোকজন এসে নদীর কাছাকাছি থাকা ৯টি পরিবারকে সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বলেন, চার মাস ধরে ঘর ভাড়া বাবদ পরিবার পিছু দু'হাজার টাকা দেবার কথাও বলা হয়। চার মাসের পর কি হবে? কি হবে বাকি পরিবারগুলির? কি হবে রাস্তায় দোকান চালিয়ে যাঁরা সংসার প্রতিপালন করেন, তাঁদের? উত্তর দেবার দায় কারুর নেই। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, উল্টে কালিমপং এসডিও দপ্তর থেকে এক অফিসার এসে ১৫টি নদী-তীরবর্তী দোকান বন্ধের আদেশ দিয়ে গেছেন। আরও বলেছেন, মিলিটারির জমিতে বসে থাকা চলবে না। বোঝাই যাচ্ছে, প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন কি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে কেউ-ই তৈরি নন, না জেলা প্রশাসন না এনএইচপিসি— তাঁরা চাইছেন লোকজন জায়গা খালি করে এমনি এমনিই উঠে যাক। উঠে যাক নাহলে ভেসে যাক। সাধারণ মানুষের জীবনের কি দাম? কি দাম পাহাড়ের, পাহাড়ি পরিবেশের?

তিস্তা এলাকায় হঠাৎ বান ডাকলে শুধু যে পাহাড়িরা ভাসবেন তা নয়, সেভক বাজার থেকে গজলডোবা পর্যন্ত যে এলাকা, সেখানে গুটি পাঁচেক বনবস্তি ও একাধিক চা-বাগান আছে, আছে অন্যান্য গ্রামও ভাসবে। উপরের তিস্তা বাঁধ থেকে হঠাৎ জল ছাড়লে কি বন্যা হলে এই বসতিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। গজলডোবার নীচের এলাকাও অক্ষত থাকবে না— সাম্প্রতিক বন্যার সময় হৃষিকেশ কি হরিদ্বারে অন্তত গোটা বিশেক বাঁধ টপকে আসা গঙ্গার জলোচ্ছাস দেখে এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

নিরাপত্তা ও প্রতিকারের দাবি

ভারতের প্রধান পরিবেশ সংগঠন ও সামাজিক আন্দোলনগুলির এক সমন্বয় মঞ্চ 'ভারত জলবায়ু-ন্যায়' বা ইন্ডিয়া ক্লাইমেট জাস্টিস এক দীর্ঘ চিঠি লিখে রাজ্য প্রশাসনকে, গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান-কে (জিটিএ), ভারত সরকার-কে ও এনএইচপিসি-কে তিস্তা এলাকায় আসন্ন বিপর্যয়ের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এনএইচপিসি-র তিস্তা নীচু বাঁধ প্রকল্পে নানান বে-আইনের কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংগঠন ও আন্দোলনগুলি দাবি করেছেন, তিস্তা উপত্যকা ও আশপাশের পাহাড়ে যে বস্তিগুলি আছে তাঁদের সার্বিক ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, উত্তরবঙ্গ সহ সিকিমে তিস্তা-রঙ্গিত নদী এলাকায় যে ১০টি বাঁধের নির্মাণ শুরু হয়ে গেছে, এবং আরও যে ৩২টি (!) বাঁধ প্রস্তাবিত, তাদের সবকটির ক্ষেত্রেই নতুন সমীক্ষা করতে হবে, এবং নতুন কোনো বাঁধের কাজ শুরু করা চলবে না। আরও দাবি করা হয়েছে পর্যটন বা অন্য উন্নয়ন প্রকল্পের অজুহাতে পাহাড়ে যথেচ্ছ নির্মাণ-কাজ করা চলবে না। আশা করা যায় কি, উত্তরাখণ্ড বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকার এবং সরকারি সংস্থাগুলি এই সব দাবি মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন? তিস্তার জলের উপরে ঝুলে থাকা মানুষ, পাহাড়ি বস্তির মানুষের তাঁদের বাসস্থানে অথবা অন্যত্র নিরাপদে, সম্মানের সঙ্গে জীবন কাটাতে পারবেন, দার্জিলিং হিমালয়ের উপর আর অত্যাচার হবে না, তিস্তা নিজের মতো বইতে পারবে?

অন্য বহু প্রশ্নের মতো, এই প্রশ্নগুলিও এখনও অমীমাংসিত। তিস্তা এলাকার তাড়া খাওয়া সন্ত্রস্ত মানুষ নদী আর আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, এখনও।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : *উত্তরবঙ্গের সারাদিন*।

৬৫ বছর আগে দেখা একটি ঘটনার বর্ণনায় রাহুল সাংকৃত্যায়ন

.... 'রোগী' গ্রামের ঠিক প্রবেশ-পথের ওপরেই বাঁদিকে একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম। একরাশ ভাঙা-চোরা করোগেটেড টিনের ছাদ তাল পাকিয়ে পড়ে রয়েছে, তারই পাশে কাঠ আর পাথরের স্তূপ। এ-বছর যে দারুণ ভাবে হিমানী সম্পাত হয়েছে — এটা তারই নিদর্শন। পাহাড়-পর্বতের যত উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো জমি, তার উপর বরফ পড়ে পড়ে সমতল হয়ে আসে। তার উপরে স্তরে স্তরে তুষার জমতে থাকে তো জমতেই থাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই সঞ্চিত তুষারের ভার এত বেশি হয়ে পড়ে যে নীচের মাটি সে ভার আর সইতে পারে না। তখন মাথার উপরে জ্বলন্ত সূর্যের গলিত অগ্নিস্রাবে গলতে থাকে সেই যুগান্ত সঞ্চিত হিমের পাহাড়। আর তারপর সেই লক্ষ লক্ষ মণ জমাট বরফ নামবার পথ করে নেয়, তখন সে কোনো বাধাকে গ্রাহ্য করে না। দেবদারুর দল কুটোর মতো সামনে নুয়ে পড়ে, গ্রামের পর গ্রাম মাথা নত করে শুয়ে পড়ে, বড়ো বড়ো পাথরের চাঙড়গুলোও নুড়ির মতো ছিটকে পড়ে, গড়িয়ে পড়ে নীচে— অনেক নীচে। সব বরবাদ করে দিয়ে চলে যায় চলমান হিমশিলা। সামনে তখন ঐরাবৎ পড়লে তাও ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে, এ তো ছার পিডব্লিউডি-র ডাকবাংলো! এঞ্জিনিয়ার তার ধৃষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

এ সব অঞ্চলে গ্রাম বসেছে অনেক দিনের অভিজ্ঞতার পর। লোকে যখন বুঝেছে— এ জায়গায় হিমপাতের সম্ভাবনা নেই তবেই সেখানে গাঁ বসিয়েছে। এ সবের পেছনে অনেক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা আছে। নদীনালা দিয়েই তো চিরকালই হিমানীধারা বৃষ্টিধারা বয়ে আসছে, সেখানে আবার কে কবে বাড়িঘর করে থাকে? এঞ্জিনিয়ার সাহেবের বেশি দুঃসাহস। ঝিরঝিরে নদীর গায়েই দেবদারু বনের ভেতরে খাসা জায়গাটি নজরে পড়েছে— ব্যস আর লোভ সামলাতে পারলেন না। দেবদারুর গাছগুলোর দিকে এক নজর দেখেই বুঝলেন, বেশ পুরনো হয়েছে, অন্তত বছর তিরিশেক তো হবেই। বানিয়ে ফেললেন একখানা সুন্দর বাংলো। সেই মনোরম বাসস্থানের আজ কি দশা! ....

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, জুন ১৯৪৮, *কিন্নর দেশে।*

মিড-ডে মিল খেয়ে শিশুমৃত্যু : এই হননের দায় কার?

তরুণ বসু

দিন কয়েক আগে একটি খবর *এই সময়* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে (৩১ জুলাই ২০১৩)। খবরের বয়ান অনুযায়ী, 'রাজস্থানের ভিলওয়ারার স্কুলে মিড-ডে মিল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল ৭৬ জন পড়ুয়া। সেখানে মিড ডে মিলের খাবারে মিলেছে মরা টিকটিকি। এ দিনই ম্যাঙ্গালোরের একটি স্কুলের মিড-ডে মিলে মিলেছে মরা ইঁদুর। পড়ুয়ারা ওই খাবার না-খাওয়ায় এড়ানো গিয়েছে দুর্ঘটনা।' দৈব আর দেব-দেবী পাপ-পুণ্য, জন্মান্তারের এই দেশে কোন্ পুণ্যের বলে ম্যাঙ্গালোরের শিশুগুলি রক্ষা পেয়েছে কে জানে। রক্ষা পেয়েছে বললাম কারণ, ভিলওয়ারার শিশুগুলি অসুস্থ। তারা পরের দিনই আর খবরে থাকবে না ফলে তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলেও আর জানা যাবে না। তাছাড়া মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে বিহারের সারণ জেলার গন্দামান গ্রামে ২৩টি শিশু বিষাক্ত মিড-ডে মিল খেয়ে এ-দেশের মানুষের সবচেয়ে বড়ো ভরসা 'ঈশ্বরের কোলে' ঠাঁই পেয়েছে। হতভাগ্য দরিদ্র মা-বাবারা নিজেদের দারিদ্র্য আর কপালকে অভিশাপ দেওয়ার বাইরে আর বড়ো একটা কিছু করে উঠতে পারবেন না। এরা মুদি দোকানদার নগদ পয়সার বিনিময়ে ভেজাল জিনিস দিলেও প্রশ্ন করতে সাহস পায় না, তায় বিনা পয়সায় দেওয়া খাবার খেয়ে কেন বাচ্চা মরল বা অসুস্থ হলো সেই কৈফিয়ত চাইবে সরকারি আমলার কাছে। কিন্তু এই হতাশ চিত্র কেন দরিদ্র মানুষ দিনের পর দিনের, বছরের পর বছর সহ্য করছেন? আসলে প্রশ্নটা হলো, কাদের প্রয়োজন মিড-ডে মিলের? আলোচনা এ-বিষয়ে খুব কম হয়েছে বলে মনে হয় না। যদিও শেষ পর্যন্ত তা যে কী ফল প্রসব করেছে তা বোধহয় কেউ জানে না। সম্প্রতি রাজস্থানের গ্রামে করা একটি সমীক্ষায় মনীষা গর্গ এবং কল্যাণশঙ্কর মণ্ডল দেখিয়েছেন যে, তফশিলি জনজাতিভুক্ত ছেলেমেয়েদের স্কুলের দিনে অর্থাৎ যেদিন তারা মিড-ডে মিল পায় সেদিন তাদের ক্যালোরি ইনটেক বেশি, ছুটির দিনের তুলনায়। আর তফশিলি জাতিভুক্ত ছেলেমেয়েদের ক্যালোরি ইনটেক স্কুলের দিনে ও ছুটির দিনে সমান। উঁচু জাতের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ছুটির দিনে ক্যালোরি ইনটেক বেশি। সরল এই তথ্যটি থেকে একটি সহজ সত্য প্রকাশ হচ্ছে যে, নিম্নতম শ্রেণির ক্ষেত্রে মিড-ডে মিলের প্রয়োজনীয়তা অনেক-অনেক বেশি। সবচেয়ে বড়ো কথা এই শ্রেণির বাচ্চারা স্কুলে যায় শুধু উপোস করে থাকতে হবে না বলে। ঠিক একই ভাবে উঁচু শ্রেণির বাচ্চার কাছে মিড-ডে মিলের কোনো প্রয়োজনই নেই। (*ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, ২৭ জুলাই ২০১৩।) এ-প্রসঙ্গে একটু অন্য ধরণের একটি বিদেশি কাহিনি-র উল্লেখ করা যায়। ফিলোনা মুতেসি, উগান্ডার ১৭ বছর বয়সী বিখ্যাত দাবাড়ু এমনই এক হত দরিদ্র ঘরে জন্মেছিলেন যে, শৈশবে তিনদিনে একদিনও খাবার খেতে পেতেন না। সে-সময় একদিন খাবারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন এক ভদ্রলোক (ইনি তাঁর বর্তমান কোচ) একটি ঘরে কয়েকজনকে খেতে দিচ্ছেন। মুতেসি দরজার ফাঁক দিয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। একটু পরে যিনি খাবার দিচ্ছিলেন তিনি ডাকলেন তাঁকে। সামনে পড়ে থাকা একটা দাবার ছক দেখিয়ে বললেন, 'এটা একটা খেলা। যদি তুমি রোজ এখানে খেলতে আস তবে খাবার পাবে।' মুতেসি সেই প্রথম দাবার ছক দেখছেন। কিন্তু তাতে কি, খাবার পাওয়া যাবে সুতরাং...। এরপর, ১৭ বছর বয়সে মুতেসি দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াই-এ...। উদাহরণ থাক ফেরা যাক দেশের কথায়।

সরকারি ভাবে বড়ো মুখ করে বলা হয়, মিড-ডে মিলের সুবিধা পায় এদেশের ১৪ কোটি শিশু। এবং স্কুলের শিশুদের খাবার সরবরাহ ব্যবস্থায় সারা বিশ্বে সর্ব বৃহৎ। স্কুলের মিড-ডে মিল চালু করার সময়ে ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এ-সম্পর্কে কয়েকটি আদেশ দিয়েছিল। তার মধ্যে ছিল, খাবার স্থানীয় ভাবে অর্থাৎ স্কুলেই রান্না হবে, এবং পরিবেশনের সময়ও তা প্রযোজনীয় মাত্রায় উষ্ণ থাকবে। (এবং তা অবশ্যই স্নাক্স জাতীয় বা রান্না না-করা অবস্থায় দেওয়া যাবে না যদিও বিভিন্ন রাজ্যের বহু স্কুলের ক্ষেত্রে সে কথা মানা হয় না)। খাবার দিতে হবে স্বাস্থ্যসম্মত, পুষ্টিকর (ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ক্যালোরি-যুক্ত) এবং সপ্তাহের প্রতিটি দিনেই খাবারের বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে অর্থাৎ একই ধরণের খাবার রোজ দেওয়া যাবে না। লক্ষণীয় ভাবে এতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, স্কুলের মিড-ডে মিল আসলে সামাজিক সমতা রক্ষার একটি হাতিয়ার আর তাই দলিত সম্প্রদায়ের মানুষরাই রান্নার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে।

অনেক সব ভালো ভালো কথা বলা হয়েছে নানা রিপোর্টে-প্রতিবেদনে? সত্যিই কি কিছু তাতে এসে গেছে সরল-নিষ্পাপ শিশুদের? আর এসে যাবে না নেতা-আমলা-উচ্চ কোটির মানুষদের? এদেশে কত শিশু আধপেটা খেয়ে থাকে, কত অনাহারে মারা যায়, এমন হাজার তথ্য নিয়ে কূটকচালির বদলে আর কবে অধিকার বুঝে নেবার পালা আসবে মার খাওয়াটা যারা নিয়তি বলে ধরে বসে আছে, এ-দেশের অর্ধেকেরও বেশি সবচেয়ে পেছিয়ে-পড়া, নিম্ন আয়ের নিম্নবর্গের মানুষের!

পুনশ্চ : এই লেখা যেদিন ছাপতে যাচ্ছে, ১ অগাস্ট ২০১৩-য় *এই সময়*-এ আবার একটি খবর, 'মিড-ডে মিল খেয়ে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ' হয়ে পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার আমডাঙা-র ভগবতী স্মৃতি বিদ্যা মন্দিরে। খবরে প্রকাশ : এদিন ওই স্কুলে পড়ুয়াদের ভাতের সঙ্গে ডিম দেওয়া হয়। খাওয়ার পরেই নীচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে।' অসুস্থ সবাইকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। □

বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন, উন্নয়ন

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

বিশ্বায়নের হাত ধরে কেন্দ্রে উদারনীতি চালু হওয়ার পর দেশ জুড়ে উন্নয়ন নিয়ে নতুন করে একটা দর্শন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেটা হলো বড়ো পুঁজি ছাড়া উন্নয়ন হবে না। আর তাই বড়ো পুঁজির বিকাশের স্বার্থে রাষ্ট্র কাজ করলে শিল্প-সম্ভাবনা দেখা দেবে। একটা দমবন্ধ অবস্থা তখন রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে। নতুন করে তাকে অক্সিজেন জোগাতে বামফ্রন্ট সরকারও ১৯৯৪ সালে এই দর্শনই গ্রহণ করে এবং তৈরি হয় নয়া শিল্পনীতি। এই শিল্পনীতির পিছনে ছিল জ্যোতি বসু-র ভাবনা। মার্কসবাদের বাস্তববাদী রূপায়ণ নিয়ে তিনি দলকে যে বার্তাটা দিয়েছিলেন, নতুন শিল্পনীতি নিয়ে কর্পোরেট জগতের কাছে সেই বার্তাই পৌঁছে দেন। বার্তাটা হলো শিল্প নির্ভর রাজ্য তৈরি করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনে পুঁজির সাহায্য নিতে হবে। ছুঁৎমার্গ আর চলবে না (নিরুপম সেন, *বিকল্পের সন্ধান*, এনবিএ, পৃ. ৯)।

পুঁজিবাদ বিরোধী যে রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে সিপিএম এতকাল রাজনীতি করেছে উদারনীতিতে বেসরকারি লগ্নির সুযোগ নিতে গিয়ে তা তারা হারিয়ে ফেলল। পার্টি ও সরকারের ভিতরে-বাইরে দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকল। বিদায়ী বাম সরকারের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম যেমন লিখেছেন—'বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার পরিচালনার কাজ খুবই কঠিন। ... আমাদের পার্টি কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক নীতির বিরোধিতা করে। কিন্তু রাজ্য সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের সেই নীতির পরিধির মধ্যে থেকেই কাজ করতে হয়। বর্তমানে আর্থিক ক্ষেত্রে যে কোনও পদক্ষেপের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হয়। এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অবস্থান নেবার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরও বেড়েছে।' (নিরুপম সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮)

এই 'সীমাবদ্ধ' পরিসরে নীতিগত দ্বন্দ্ব ভুলে জ্যোতি বসু-র সরকার এবার পুঁজির খোঁজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিনিয়োগ টানতে শুরু হলো দেশি-বিদেশি কাগজে বিজ্ঞাপন, সেমিনার বণিকসভাতে বক্তৃতা, শিল্পপতিদের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক। শুরু হলো সিপিএমের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা : পুঁজির দোসর হয়েছে সিপিএম। কেতাবি বামপন্থাকে সামনে রেখে সিপিএমের বিচ্যুতি কতখানি তাই নিয়ে সরব হলেন একজন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী। রাজনীতির মঞ্চে এতদিন শিল্পের দুর্দশা নিয়ে একহাত নিত বিরোধীরা। বিনিয়োগ আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা সরব প্রতিবাদ জুড়ে দেন প্রস্তাবিত প্রকল্পের জমি নিয়ে। এমনকি পুঁজির রং লাল (রাশিয়া না চিন) না নীল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, না ব্রিটেন-ইউরোপ) তা নিয়েও সোরগোল বেঁধে গেল। দুর্ভাগ্য বাঙালির এটাই যে, যারা এসব প্রশ্ন তুলে শিল্পয়নে রাজ্যকে পিছিয়ে দিয়েছে তারাই রাজ্যে শিল্প কেন হয় না বলে বাজার গরম করেছে। শিল্প যে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত, তা নিয়ে রাজনীতি চলে না, সেই বোধটাই নেই। শিল্প এ রাজ্যে ভোটের রাজনীতির বিষয়ে পর্যবসিত হলো। রাজ্যের উন্নয়নে সেটাই সব থেকে বড়ো ট্র্যাজেডি।

১৯৯৪ সালে বামফ্রন্ট যে শিল্পনীতি নিয়েছিল তার মূল কথাই ছিল উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ চাই। তা সে সরকারি, বেসরকারি, বিদেশি লগ্নি যাই হোক না কেন এই শিল্পনীতি প্রসঙ্গে *গণশক্তি*-তে একটি সাক্ষাৎকারে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'পুঁজিপতিরা মুনাফার জন্যই শিল্পস্থাপন করে। আবার শিল্পের প্রয়োজন হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। ওই নীতিতে আমরা পারস্পরিক সুবিধাজনক ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিদেশি প্রযুক্তি ও বিনিয়োগকে স্বাগত জানাই।...পশ্চিমবঙ্গে কাজের ও বিনিয়োগের পরিবেশ নেই— একথা বলা হতো। ধীরে ধীরে এই ধারণাকে কাটানো গেছে।' (শুভাশিস মৈত্র সম্পা., *শিল্পায়ন : তর্ক ও তথ্য*, দীপ প্রকাশন, পৃ. ৩।)

বামফ্রন্টের এই নতুন শিল্পনীতিকে সরাসরি সিপিএমের দ্বিচারিতা বলে অনেকে সমালোচনা করেন। ১৯৯১ সালে যখন কেন্দ্রীয় সরকার উদারনীতি ঘোষণা করেন সিপিএম তাকে দেশের পক্ষে 'সর্বনাশ' বলে মন্তব্য করে। অথচ তার তিন বছরের মাথায় নিজেরাই এমন একটি নীতি নেয় যা উদারনীতির মতোই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করেই উন্নয়ন ঘটাতে চায়। কেন্দ্রের সংস্কার নীতির বিরোধিতা করে, সরকারে বসে তার সুযোগ নিতে চায়। এর জন্য তাদের জবাব : 'বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে এবং বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বে কেন্দ্র যে পরিধি বেঁধে দিয়েছে তার মধ্যে থেকে রাজ্যের স্বল্প অর্থবলের ওপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন সম্ভব ছিল না। একটি মাত্র রাজ্যে পুঁজিবাদী উন্নয়নের পথ পরিবর্তন করাও সম্ভব ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজের ক্ষমতা বলে পুঁজিবাদী জোতদারী ব্যবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।...সর্বভারতীয় স্তরে পার্টি যদি বিকল্প নীতি সামনে রেখে জনগণকে তার পক্ষে সামিল করতে সচেষ্ট হতো, তার অর্থ এই নয় যে, যে তিনটি রাজ্যে আমরা সরকার পরিচালনা করি সেখানে এই বিকল্প নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব।' (*বামরাজ : তত্ত্ব ও চর্চায়*, চর্চাপদ, পৃ. ১৫)। শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন নিরুপম সেন তাই লিখলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণেই শিল্পে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বন্ধ, রাজ্য সরকারের একক প্রচেষ্টায় শিল্পায়ন অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সামনে একটিই পছন্দ : হয় বিনিয়োগ হবে অথবা হবে না। বিনিয়োগ হলে দেশি-বিদেশি বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগই হবে। অন্যতর বিকল্প নেই।' (নিরুপম সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২-৫৩।)

অতএব বিনিয়োগ টানতে 'অল আউট' অভিযান চলল। কিন্তু বিশ্বায়নপন্থী উন্নয়ন কর্মসূচির একটা বিকল্পের যে ভিত্তি এই রাজ্যে বামফ্রন্টের

প্রথম দেড় দশকের পরিচালনা ও রাজনীতির ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছিল তাকে অবহেলা করা শুরু হলো। ভূমি সংস্কারের কাজটা অসম্পূর্ণ রেখে শিল্পের জন্য বিনিয়োগ টানতে আগ্রহী হয়ে উঠল বাম নেতৃত্ব। ফলে যেটা হলো সেটা আরও খারাপ। ধান উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেও ধান চাষিদের উদ্বৃত্তকে কৃষিভিত্তিক শিল্প উৎপাদনের জন্য ব্যবহারে উদ্যোগ নেওয়া হলো না। রপ্তানির জন্যও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হলো না। সহায়ক মূল্য বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু তার সুবিধাটা কুক্ষিগত করেছে বড়ো চাষি এবং ফোড়েরা। আসলে সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা হয় অনেক দেরিতে, ছোটো চাষিদের সংসার চালাতে উৎপন্ন ফসল বেচে দিতে হয়। তারা ফসল ধরে রাখতে পারে না অতদিন। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার যে ভাবে হয়েছে তা নিয়েও বাস্তবে অনেক সমস্যা আছে। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে ছোটো চাষিরা জমিতে চাষ করতে না পেরে মাঝারি বা ধনী চাষিদের হাতে তুলে দিয়েছে—এমন উদাহরণ প্রচুর। এ নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে। দেখা গেছে, এ রাজ্যে ভূমি সংস্কারের পর ছোটো জোতের সংখ্যা কমেছে। অথচ ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যা বেড়েছে।

এ থেকেই প্রশ্ন ওঠে, চাষি বাড়ল, অথচ জোতের সংখ্যা কমল কেন? আসলে চাষের খরচ উত্তরোত্তর বাড়ছে। ভূমি সংস্কারের ফলে যেটুকু জমি পাওয়া গেছে তাতে চাষ করে ফসলের দাম তুলতে পারছে না তারা। অত অল্প জমিতে যা ফসল হয় তার জন্য চাষের যা খরচ সেটুকুও ফসল বেচে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্ষুদ্র জমির মালিকরা তাদের জমি বর্গা প্রথায় চাষের জন্য দিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে মাঝারি বা বড়ো কৃষকদের। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে (২৫তম রাউন্ডের সমীক্ষা অনুযায়ী) অশোক রুদ্র লিখেছেন, 'আধ একর ও ক্ষুদ্রতর জোতের চাষীদের শতকরা নিরানব্বই ভাগেরই হাল নেই, লাঙলও নেই। এবং যেসব চাষীর জোতের আয়তন ১.২৫ একর থেকে ২.৫০ একর পর্যন্ত তাদেরও প্রায় সিকি ভাগের না আছে হাল, না আছে বলদ। আর আজকাল চাষ করতে শুধু হাল বলদ হলে চলে না, রাসায়নিক সার, সেচের জল, উন্নত জাতের বীজ প্রভৃতি এমন অনেক উপাদানের ব্যবস্থা করতে হয় যা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এই ব্যয় যারা বহন করতে পারে সেই সক্ষম চাষীরা এগিয়ে আসছে ক্ষুদ্র জমির মালিকদের থেকে ভাগ বা ঠিকা প্রথায় জমি নিয়ে চাষ করার জন্য।' (অশোক রুদ্র, *আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক*, আনন্দ, পৃ. ৮০।) বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে গৃহীত উদারনীতিতে কৃষির উপর যে ভাবে আক্রমণ নেমে আসে তাতে সাধারণ, ক্ষুদ্র-কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের অবস্থা আরও খারাপ, আরও সঙ্গীন হয়ে ওঠে। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে অনেক অগ্রগতি হয়েছে, ধান উৎপাদনে দেশের মধ্যে সেরা হয়েও কিন্তু বিপুল জনসংখ্যা রয়ে গেছে দারিদ্র্যসীমার নীচে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, জনসংখ্যার ২১ শতাংশ দরিদ্র। ২০০৫ সালে দেশের ঋণগ্রস্ত কৃষক পরিবারের বসবাসের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ছিল দেশের প্রথম পাঁচটি রাজ্যের অন্যতম। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে ওই বছরে রাজ্যে ঋণগ্রস্ত কৃষক পরিবারের সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ। জমির ওপর চাপ বৃদ্ধির ফলে জমি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ব্যাপক ভাবে ঘটেছে। স্টেট ইনস্টিটিউট অফ পঞ্চায়েতস্ অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের ১৫ শতাংশ কৃষককে চাপের মুখে জমি ছেড়ে দিতে হয়। ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে আরও জানা গেছে, বহু কৃষকের জমিই কিনে নিয়েছে জমি মালিকরা। তা সত্ত্বেও বিক্রি হওয়া জমিতেই চাষ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে, স্রেফ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বাম আমলে চালু হওয়ার পর মনে হয়েছিল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের প্রক্রিয়ায় গরিব মানুষদের জীবন-জীবিকা ও অস্তিত্বের সংগ্রামে সুরাহা হবে। সুরাহা যে হয় নি কিছুটা তা নয়, তবে তা অনেক সময়ই হয়েছে শাসক দলের প্রতি আনুগত্য দেখানোর মাধ্যমে। যারা তা পারেনি,তাদেরকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছে। ফলে পঞ্চায়েত- গুলো ক্রমে ক্রমে হয়ে দাঁড়ায় তিক্ত পার্টি সংঘর্ষের ক্ষেত্র। বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার সুযোগ সীমাবদ্ধ থেকেছে দলীয় অনুমোদনের বেড়াজালে। ফলে স্থানীয় সমস্যা ও উন্নয়ন কখনই পঞ্চায়েত স্তরে অবাধ রাজনীতির মূল উপজীব্য হয়ে উঠতে পারে নি। কার্যত যা হওয়ার তাই হয়েছে, শাসকদলের দলতন্ত্রে পঞ্চায়েত আদর্শ হারিয়ে গেছে। পঞ্চায়েত মারফত অনুদান বিতরণ কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে পার্টির অনুমোদনে। ফলে জমিহারা কৃষকরাও পার্টিতন্ত্রের কঠোর বেড়াজাল ডিঙিয়ে উন্নয়নে সামিল হতে পারে নি। এ ভাবেই ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতা ও ছদ্ম বেকারত্বে ছেয়ে যায় গ্রামবাংলা ও মফস্সলের গ্রামীণ সমাজ। তৈরি হতে থাকে চাপা অসন্তোষ। বিগত দু'দশকের বিশ্বায়ন পর্বে বাজার অর্থনীতির অনুপ্রবেশের স্বার্থে পরিকাঠামোর উন্নয়ন, রাস্তাঘাট-ব্রিজ-বাজারের প্রসার এবং ক্ষুদ্র পুঁজির ক্রমবিকাশে গ্রামীণ সমাজে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। একদল মানুষের দারিদ্র্য কমে, হাতে টাকাও আসতে থাকে কৃষি ছাড়া অন্য নানা সূত্রে। এই সময়ে শহুরে জীবনে সব থেকে বড়ো পরিবর্তন ঘটে সামাজিক-সাংস্কৃতিক চালচিত্রে। মিডিয়া, বিশেষত টিভির দাপট বাড়তে থাকে এবং বাজার সম্প্রসারণের সন্ধানে বিভিন্ন প্রোগ্রাম শুরু হয় যা বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক অভিঘাতকে গ্রামবাংলায় সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়। রাজ্যের এক প্রান্তের সামাজিক আলোড়ন অন্য প্রান্তের মানুষের রাজনৈতিক সামাজিক চেতনায় ধাক্কা দিতে থাকে। অন্যদিকে, গ্রামবাংলায় জীবিকাহীনতা থেকে জন্ম নেওয়া অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু তাকে সঠিক ভাবে সংগঠিত করে সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাত ধরে অর্থনৈতিক রূপান্তরের রাস্তা খুঁজতে দলীয় রাজনীতি ব্যর্থ হয়। পুরোনো প্রজন্মের সঙ্গে নবীন প্রজন্মের চিন্তা চেতনা মূল্যবোধে দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়। তাকেও রাজনৈতিক ভাবে নেতৃত্ব দেওয়া যায় নি। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার যথেষ্ট নয় তাই সামাজিক অর্থনৈতিক বিবর্তন যতটুকু হয়েছে তাতে উন্নয়নের স্রোতে সমাজের অগ্রণী অংশের সকল মানুষ না এগোতে পেরেছে ঈপ্সিত লক্ষ্যে, না পেরেছে পিছিয়ে পড়া মানুষ ক্ষোভ-বিক্ষোভ উগরে দিতে কিংবা অনুন্নয়ন থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে। বরং দলীয় রাজনীতির চোরা স্রোতে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে গেছে।

এই অবস্থায় রাজনীতিতে অগোচরেই নিম্নবর্গের ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। ২০০৬-এর বিধান সভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিপুল জয়-লাভ এ-রাজ্যের রাজনীতিতে একটা বড়ো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সেই সময় আরও উন্নয়নের স্লোগানে জোট চেয়েছিল শাসক বামফ্রন্ট। তাদের বিপুল ভোটে জয়লাভে বাম নেতৃত্ব সুনিশ্চিত হয় যে, মানুষ উন্নয়ন চাইছে। কিন্তু সেই উন্নয়নের প্রকৃতি কী হবে, চরিত্র কেমন হবে, কোন্ পথে হবে, এসব নিয়ে দলীয় ম্যানিফেস্টোতে যে কথাই লেখা থাক না কেন, রাজ্যবাসীকে সুস্পষ্ট কোনো রূপরেখা দেওয়া হয়নি। মানুষ উন্নয়ন চাইছে এটা বোঝা সহজ; কিন্তু সেই উন্নয়নের সঙ্গে মানুষ কি ভাবে নিজেকে জড়াতে চায়, কি ভাবে

তার জন্য এগিয়ে আসতে চায়, তা নিয়ে সম্যক ধারণা বাম নেতৃত্বের ছিল না। ওদিকে বেকারি বাড়ছে। কাজ দিতে হবে। যদিও বাম নেতৃত্ব বুঝেছিল যে, এই বাস্তব সমস্যার সমাধানে আরও উৎপাদনশীল অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু তার জন্যে কোন্ পথে উন্নয়ন ঘটালে মানুষ আরও বেশি উৎপাদনশীল কর্মে যুক্ত হয়ে আয় বাড়াতে পারবে তা নিয়ে স্পষ্ট সমীক্ষাভিত্তিক কোনো ধারণা নিয়ে এগোতে চায় নি। তাই বিশ্বায়ন প্রেক্ষিতের উন্নয়ন ভাবনাকে আঁকড়ে ধরে— বড়ো পুঁজি ছাড়া উন্নয়ন হবে না; কৃষিজমিতেই শিল্প হোক; প্রয়োজন বৃহত্তর উন্নয়নের স্বার্থে জোর করেই সেই উন্নয়ন ঘটাতে হবে— এমন একটা ভাবনা থেকেই অনিবার্য হয়ে ওঠে রাজারহাটে-সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ। রাজারহাটে তা সফল হয়েছিল যে রাজনৈতিক আলাপ-আলাচনার হাত ধরে, সিঙ্গুরে তা ব্যর্থ হয়।

বাম শাসকদের সব থেকে বড়ো ভুল ছিল উন্নয়নকে জোর করে চাপানোর চেষ্টা। উন্নয়ন মানুষই চায়, কিন্তু মানুষের সঙ্গে কথা বলেই তার পথ ও প্রকরণ চূড়ান্ত করতে হয়, প্রশাসন দিয়ে নয়। এটাই রাজনীতির কাজ। বাম শাসকরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনমত সংগঠন, সমর্থন আদায় ও বিরোধিতাকে নির্জীব করার কাজে ব্যর্থ হয়। প্রশাসনিক ভাবে তারা উন্নয়নের পথ ও পটভূমি রচনা করতে চেয়েছিল কিন্তু সমাজ তৈরি ছিল না এই ভাবে উন্নয়নের পথে হাঁটার জন্য। কারণ শুধু জমি অধিগ্রহণজনিত অনিশ্চয়তাই নয়, জমি হারানোর পর সুনিশ্চিত কোনো বিকল্প আয়ের পথও সরকার দেখাতে পারে নি। বাজার অর্থনীতির নিয়মে যখন উন্নয়ন আসে তখন তা কেবল পুঁজির বিকাশের পথই সুনিশ্চিত করে, কিন্তু সেই পথচলায় যারা বলি হন, তাদের বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ-অসন্তোষ মেটানোর দায় পুঁজি নেয় না। বাম শাসকরা তাদের মতাদর্শ ভুলে, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে কেবল বড়ো পুঁজিকে দিয়ে যে ভাবে উন্নয়ন ঘটাতে চাইছিল, তাতে একটা চোরা অন্তর্দ্বন্দ্বও তৈরি হয়েছিল। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, উন্নয়নের সুফল কারা পাবে? সাধারণ মানুষের কত অংশ এ থেকে চাকরি পাবে? বাঙালি ব্যবসায় আস্থা পায় না। তাই সিঙ্গুরে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ হলে তা থেকে যে আরও অনেক কোটি টাকার ব্যবসার সুযোগ তৈরি হবে এ নিয়ে আশা জাগে নি বাঙালি সমাজে। তার থেকে তারা অনেক বেশি ভাবিত হয়েছে উন্নয়নের সুফল কতটা কুক্ষিগত করবে টাটারা, তার জন্য যারা জমি দিচ্ছে তারাই বা এরপর কী করবে?

এইখানেই ব্যর্থ হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। উন্নয়নের একটা রোডম্যাপ হাজির করতে হয় সরকারকে। বিচ্ছিন্ন পুঁজি নির্ভর উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে যে বিকাশ হয় তাতে সামগ্রিক উন্নয়ন হয় না। বড়ো পুঁজি নির্ভর উন্নয়নেও ভারসাম্যতা নষ্ট হয়, যদি না সেটা একটা বড়ো পরিকল্পনা করে সুসংবদ্ধ আকারে না করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে বড়ো পুঁজি আসছিল। কিন্তু কোনো পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ তৈরি করে তাদেরকে তাতে অংশ নেওয়ার জন্য ভাবা হয় নি। তাহলে প্রথমেই যেটা করতে হতো সেটা হলো, রাজ্যব্যাপী সমীক্ষাকরণ, জমির লভ্যতা, ল্যান্ডব্যাঙ্ক গঠন, অনুসারী শিল্পের বিকাশের জায়গা তৈরির সম্ভাবনা। এসব ভেবে পরিকাঠামো তৈরি করে উন্নয়নের জন্য বড়ো পুঁজিকে ডাকা হলে জনসাধারণের উপর উন্নয়নকে চাপিয়ে দেওয়া হতো না। এই চাপানো শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সরকার ভাবছে তারা উন্নয়ন করছে। রাজ্য এগোবে। রাজ্যবাসী উপকৃত হবে। কিন্তু জনসাধারণ সেই উন্নয়ন গ্রহণ করবে তখনই যখন সাধারণ মানুষ দেখবে তাতে তার আয় বাড়ছে। আয় বাড়াতে গেলে দু'টি জিনিস দরকার। এক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো, দুই উৎপাদিত শ্রম বা পরিষেবাকে বাজারনীতি করার ক্ষমতাবৃদ্ধি। বুদ্ধবাবুর উন্নয়ন মঞ্চে এই দু'টি বিষয় মানুষকে বোঝানো হয় নি। বোঝানোর জন্য যে রাস্তায় হাঁটার দরকার ছিল, তাঁর সরকার সেই পথে হাঁটেও নি। কোনো প্রকল্প নেওয়া হয় নি যার দ্বারা কোটি কোটি বেকারের উৎপাদন-শীলতা বাড়ে। কৃষিতে যুক্ত হলে তা বাড়বে না। কারণ জমির মাথাপিছু উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমছে। চাষের খরচ বাড়ছে। ফসল বেচে একর প্রতি আয় কমছে। কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত তৈরি হচ্ছে যতটুকু তাকে ভিত্তি করে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ শিল্প গড়ে তুলতে সরকারি সাহায্য দিয়ে বাম সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাবেও নি। রপ্তানিভিত্তিক ইউনিট স্থাপনে সরকার সাহায্য পেলে এই ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল। সেই সম্ভাবনাকেও কাজে লাগাতে পারে নি।

রাজ্যের উন্নয়নের সম্ভাবনার সমীক্ষা ও তা নিয়ে পরিকল্পনা করার জন্য উচিত ছিল রাজ্য সরকার ও জেলা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সুলুক-সন্ধান। তা না করে বৃহৎ আন্তর্জাতিক পুঁজির দোসর ম্যাকিনশে সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা করানো হলো। ম্যাকিনশে আন্তর্জাতিক বাজারের হিসেবে, আন্তর্জাতিক বৃহৎ পুঁজির লগ্নির লাভ ক্ষতির হিসেবে উন্নয়নের সুপারিশ করে, যার সঙ্গে রাজ্যবাসীর উন্নয়ন ভাবনা মেলে নি। তার পরেও রাজ্য সরকারের উচিত ছিল ম্যাকিনশের রিপোর্ট মতো রাজ্যে মোটর কারখানা বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বা চাষের প্যাটার্ন বদলে উদ্যোগ নেওয়ার আগে তা নিয়ে রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত স্তর থেকে নগর কলকাতায় খোলা-মেলা আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে একটা সচেতন আন্তঃসংযোগ গড়ে তোলা। তাতেও সহমতের ভিত্তিতে একটা উন্নয়ন ভাবনা গড়ে উঠত, রাজ্য-বাসীকে সঙ্গে নিয়ে তা রূপায়ণে তখন কোনো সমস্যা হতো না।

এই সমালোচনার পক্ষে বিপক্ষে কিছু যুক্তি থাকা সত্ত্বেও বলা যায়, একটা স্তর থেকে অন্য একটা স্তরের বিবর্তন হতে গেলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সাধারণত যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, তাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ইপ্সিত লক্ষ্যে পরিচালিত করটা খুবই জরুরি। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও বাঙালি সমাজ যে ২০০৫-০৬ সালে একটা স্তর থেকে অন্য একটা স্তরে বিবর্তিত হতে চাইছে, বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াতেই তার হাতে ধরে নাগরিক সমাজের প্রতিক্রয়ায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গ্রাম-শহর সর্বত্রই জনসমাজ আন্দোলিত হচ্ছিল। অনেকখানি না-পাওয়া আর অনেকখানি পাওয়ার সম্ভাবনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বজাত সংশ্লেষে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্থিতিশীল রাজনীতির দৌলতে বাম শাসকদের উপরেই পরবর্তী বিবর্তনের পথ খোঁজার দায়িত্ব দেয়। কিন্তু তারপর বাম শাসকরা যে ভাবে জনসমাজকে বুঝতে না চেয়ে এক বগ্‌গা বড়ো পুঁজি প্রোথিত উন্নয়ন ভাবনাকে ভিত্তি করে জোর করে উন্নয়নকে চাপাতে চায় তাকে মেনে নেওয়ার অবস্থায় ছিল না গ্রাম-শহরের কোনো মানুষই। তাই সিঙ্গুর বা পরবর্তীতে নন্দীগ্রাম নিয়ে বিরোধীদের আন্দোলন দ্রুত পায়ের তলার জমি কেড়ে নেয় সিপিএম তথা বাম দলগুলির। নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব হবে না বলেও তাই জনসমর্থন ফিরে পায় নি বুদ্ধদেবের সরকার। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রাজনৈতিক ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া হয় যখন পুলিশের পোশাক পরিয়ে ভাড়া করা বাহিনী আর দলীয় সমর্থকদের নিয়ে গুলি চালিয়ে গ্রাম দখলের চেষ্টা হয়। কার্যত এটা ঠিক যে নন্দীগ্রাম ছিল সিপিএম বনাম তৃণমূলের গ্রাম

দখলের লড়াই। এর প্রতিক্রিয়াটা সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল ভোটের রাজনীতিতে। কিন্তু থাকেনি। উল্টে পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। তাতেও কিন্তু ভোটের রাজনীতির গ্রাম দখলের বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে নি। স্লোগান উঠেছিল বড়ো পুঁজি নির্ভর উন্নয়নের বিরুদ্ধে। রাজনীতিতে চর্চা শুরু হয় শিল্পায়নের পথ ও প্রকরণের বাছাইয়ে সরকার কতটা ঠিক, কী তাদের করা উচিত ছিল তা নিয়ে। অর্থনীতিতে বিতর্ক তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গে এখন কৃষি না শিল্প কোন্‌টা বেশি জরুরি? শিল্প যদি জরুরি হয় তাহলে কোন্ শর্তে, কী ভাবে হবে? আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে, এই ঐতিহাসিক তর্ক-চর্চা শেষপর্যন্ত এক প্রতিরোধী আন্দোলনে বিবর্তিত হয়ে বাম শাসনের অবসান ঘটায়। আর বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বাঙালির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ নির্দ্ধারণে ব্যর্থ হলো বামফ্রন্ট।

অন্যদিকে বামফ্রন্টের শিল্পায়নের চেষ্টা কেন ভুল, এসব নিয়ে সারা রাজ্য আন্দোলিত হলো, বিরোধী শিবির থেকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সমালোচনার ঝড় তুলল, কিন্তু পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই রাজ্য কীভাবে অন্য রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়োবে তা নিয়ে কোনো সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো গেল না। শুধু একটা দায় চাপানো থাকল রাজনীতিতে যে, মানুষের ভোট পেতে গেলে জোর করে জমি নেওয়া চলবে না।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য একটি বিশেষ কথা বলা প্রয়োজন। ১৯৯০-এর দশকের গোড়া থেকে কৃষির বিকাশ ব্যাহত হয় এই রাজ্যে। বড়ো শিল্পেরও বেশি বিস্তার ঘটে নি। সরকারি স্তরে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা যে যথারীতি চলছিলই, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান থেকেই তা দেখা যাচ্ছে। ১৯৯১-এর আগস্ট থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এদেশে যত লেটার অফ ইনটেন্ট এবং ডিরেক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স ইস্যু হয়েছিল, তার ১৫.২৩ শতাংশ পেয়েছে মহারাষ্ট্র, আর তামিলনাড়ু পেয়েছে ১৫.২৯ শতাংশ। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে মাত্র ২.২৫ শতাংশ। এর ফলে সেই সমস্ত রাজ্যে যেমন বেকারত্ব কমেছে, একই ভাবে কেন্দ্রীয় বদান্যতার সুযোগে বেকারত্ব কমেছিল অন্ধ্রে (৬.৯৮ লাখ), কর্নাটকে (২.৪৬ লাখ),কেরলে (০.৯৩ লাখ), মধ্যপ্রদেশে (বর্তমান ছত্তীসগঢ় সহ মোট ৫.৬৭ লাখ)। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা যে কতখানি ক্ষতিকারক হয়েছিল তা এই পরিসংখ্যান থেকেই পরিষ্কার। অন্যান্য রাজ্যে যখন বেকারের সংখ্যা কমেছে, পশ্চিমবঙ্গে তখন বেড়েছে (১৩ কোটি ২৯ লাখ)। (সূত্র : www.Indiastat.com)।

এই সব তথ্য বিশ্লেষণ করে 'পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন : পটভূমি,প্রেক্ষিত, পরিণতি' প্রবন্ধে তথাগত রায় দেখিয়েছেন, এই রাজ্যে গড়ে বেকার বাড়ছিল বছরে ২ লক্ষেরও বেশি। ফলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে, দেশের আট শতাংশ মানুষ বাস করে এই রাজ্যে কিন্তু নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা দেশের মোট হিসেবের সতেরো শতাংশ। (শুভাশিস মৈত্র সম্পা., পূর্বোক্ত।)

সরকারি ক্ষেত্র ছাড়া বেসরকারি ক্ষেত্রে এই রাজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত কম। কিন্তু কেন?

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই রাজ্যে যেসব কারণে শিল্পে পুঁজি লগ্নি হচ্ছিল কম, তার সঙ্গে আরও অনেক নতুন সমস্যা জোটে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেখানে শিল্পে বেসরকারি পুঁজি টানার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল উদারীকরণের শুরুতেই, পশ্চিমবঙ্গের বাম শাসকরা নীতিগত ভাবেই সেটা করতে চায় নি। শুধু তাই-ই নয়, রাজনৈতিক চাপ আসত আগ্রহী শিল্পপতিদের উপর। সর্বোচ্চ স্তরে ছিল পার্টির শাসন, সর্বনিম্ন স্তরে ছিল পার্টির প্রশ্রয়ে তৈরি হওয়া স্থানীয় মস্তান বাহিনীর ইমারতি দ্রব্য সরবরাহ থেকে কর্মী নিয়োগে। যার নিট ফল হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার মতো শিল্প বিরোধী পরিবেশ। দুর্দশাগ্রস্ত পরিকাঠামো,আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, আইন শৃঙ্খলা ও সার্বিক কর্মসংস্কৃতির ক্রমাবনতি। এসবের ফলে দেশের বড়ো ২০টি রাজ্যের মধ্যে ১৯ নম্বরে ঠাঁই হলো পশ্চিমবঙ্গের।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে বেশ লক্ষণীয় ভাবে। এটা একটি বিশেষ ধরণের অর্থনৈতিক প্রবণতা যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে দেখা যায় নি। ভূমি সংস্কারের কিছুটা সাফল্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে অতিরিক্ত ক্ষুদ্র সঞ্চয় সৃষ্টি করতে থাকে, তাই-ই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উৎপাদন সংস্থা তৈরিতে উৎসাহ দেয়। কৃষির সমৃদ্ধির ফলে গ্রামীণ বাজারে যে চাহিদা বাড়তে থাকে, তা মেটাতেই এই সব সংস্থা গজিয়ে ওঠে। অসংগঠিত ক্ষেত্র, তবু কারখানার সংখ্যায় এবং কর্মী নিয়োগে এর ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্রমশ এদের পণ্য শহরাঞ্চলেও বাজার পেতে শুরু করল। ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটতে থাকল ক্ষুদ্র শিল্পের হাত ধরে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৪-৯৫ সালে এই ধরণের ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা ছিল ১৯ হাজার ৯০। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ছিল ১৫ হাজার ৩১২ টি। ২০০০-০১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ হাজার ৭১১টি। এর মধ্যে গ্রামে ২১ হাজার ২৩৭টি। এই সব সংস্থায় কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা সাড়ে ৫৮ লাখেরও বেশি। এদের মধ্যে ৪৪ লাখের কিছু বেশি কাজ করে গ্রামীণ ক্ষুদ্র সংস্থায়। কোনো সরকারি সহায়তা ছাড়াই এই অগ্রগতি শুধু সংখ্যার নিরিখে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে যে সর্বাধিক তাই-ই নয়, অর্থনীতিতে এর ফলে একটি নয়া প্যাটার্ন তৈরি হয়। বড়ো শিল্প বড়ো পুঁজি ছাড়াই শুধু এই ধরণের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিকাশের ফলে পশ্চিমবঙ্গ উৎপাদনের নিরিখে অনেক সময়ই সর্বভারতীয় বৃদ্ধির গড় হারের চাইতে বেশি হারে বৃদ্ধি ঘটাতে সফল হয়। কৃষি এবং কৃষির উদ্বৃত্ত থেকে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবসার উপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও মফস্‌সল শহরগুলির অর্থনীতির প্রসার ঘটতে থাকে। ২০০১-এ দেখা যাচ্ছে, এই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের চল্লিশ শতাংশ মানুষ অ-কৃষিকাজে যুক্ত হয়ে পড়েছে। জলপাইগুড়ি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণার মতো কিছু কিছু জেলায় তা ৫০ শতাংশের বেশি। প্রথাগত নথিভুক্ত শিল্পের চাইতেও এই রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রে অ-নথিভুক্ত ক্ষুদ্রসংস্থাগুলিতে আয় বেশি সৃষ্টি হতে থাকে। ২০০৩-০৪ সালে অ-নথিভুক্ত শিল্পে আয় সৃষ্টি হয়েছে ৭২৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার, রাজ্যের মোট শিল্প আয়ের ষাট শতাংশ, ভাবা যায়! পরবর্তী বছরগুলিতেও এই অনুপাতটি অপরিবর্তিত ছিল।

শুধু শিল্প নয়, সেবামূলক কাজ, পরিবহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নির্মাণ-শিল্প— এ রাজ্যের সর্বত্র আছে ক্ষুদ্র সংস্থার আধিপত্য। (*দেশকাল ভাবনা*, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১০।) স্বল্পপুঁজি নির্ভর এই ধরণের অর্থনৈতিক বিকাশে চমকপ্রদ উন্নয়নের মোহ নেই, কিন্তু অনেক কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করে যে উন্নয়নটা ঘটে তাতে অলক্ষ্যে গড়পড়তা উন্নতির বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। এই ভিত্তিটা ক্রমশ শক্ত ও প্রশস্ত হয়ে ওঠে। জনসংখ্যার বিপুল চাপ অনেকটা নিতে সমর্থ হয়। ১৯৯৪-২০০৪ সময় পর্বে কৃষি আর ক্ষুদ্র অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিকাশের মধ্যে দিয়ে স্থিতিশীল রাজনীতির বাতাবরণ গড়ে ওঠে। ২০০৬-এ বামফ্রন্টের বিপুল জয়ের পিছনে এটাও ছিল একটা বড়ো ফ্যাক্টর। □

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রামোন্নয়ন

ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়

''মুর্শিদ ধন হে কেমনে চিনিব তোমারে...''

স্বাধীনতোত্তর ভারত এবং এশীয় উপমহাদেশের অর্থনীতিতে ও রাজনীতিতে গ্রামোন্নয়ন একটি স্থায়ী চর্চার বিষয়। শিল্পায়নের যে যুক্তি এই সমকালে বিশেষ ভাবে বিতর্কিত তার সঙ্গে নগরায়ণের প্রসঙ্গও যেমন এসে যায় তেমনই সেই প্রসঙ্গে গ্রাম ও তার উন্নয়নের প্রসঙ্গও চলে আসে। এক ভাবে দেখলে, এই সব আলোচনায় নগর ও গ্রামের উন্নয়নকে একই সরলরেখায় স্থাপন করা হয়; গ্রামের উন্নয়নকে গ্রামের শহরে পরিণত হওয়ার মধ্যেই দেখা হয়ে থাকে। গ্রাম অর্থাৎ অশিল্পায়িত মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ক্রমশ নাগরিক তথা শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর--- এই সমীকরণের উপর ভর করেই আধুনিক বিশ্বের পুঁজি বিকাশের পথের সন্ধান করছে। এমন একটা পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্যকে কেবল উন্নয়নের দৃষ্টিতে দেখার ভঙ্গিকে নেহাৎই সরলীকরণই বলে মনে হতেই পারে। আমাদের কৌতূহলের বিষয় এই যে, এই সমীকরণের বিপরীত দৃষ্টিকোণকেও সাধারণ ভাবে সরলীকৃত কল্প তথা ইউটোপিয়া হিসাবে দেখা হয়ে থাকে।

প্রথম সমীকরণের যুক্তি বিশ্বায়িত পুঁজির ক্রমবিকাশ এবং কেন্দ্রায়নের পক্ষে সমর্পিত— পরিকাঠামো, বাস্তু, রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণে অর্থ বিনিয়োগে আজ পৃথিবী আর কোনো রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। বহুজাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা এই সমীকরণকে প্রমাণ করার দায়িত্বে সংগঠিত। দ্বিতীয় তথা প্রতিযোগী সমীকরণের প্রবক্তারা অন্যদিকে যে প্রস্তাব করছেন তা বিশ্বায়নের বিপ্রতীপে স্থানীয়তার। এই দুই সমীকরণের সমতা একটাই, বিশ্বায়িত তথা স্থানীয়তা-র বিশ্বে প্রথম যুদ্ধ-উত্তর সাংবিধানিক রাষ্ট্রের ধারণাকে এই দুই ধারণাই প্রশ্ন করছে।

'স্থানীয়তা'র এই তাত্ত্বিক ধারণার সমর্থনে সঙ্গত কারণেই যে দুই চিন্তাদর্শের প্রসঙ্গ আলোচিত তা— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবনা প্রসূত। ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতীয় ভূ-খণ্ডের রাজনৈতিক স্বাধিকারের আন্দোলনে এই ভূ-খণ্ডের সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে মত রচনা করেছিল তা এই সমাজ ও তার অর্থনীতিকে কৃষিভিত্তিক এবং অ-শিল্পায়িত হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল। এই মতটি অবশ্যই রাজনৈতিক এবং যার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিকতা-উত্তর খণ্ডিত ভূ-খণ্ড সার্বভৌম সাংবিধানিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে। রাষ্ট্রের এই ধারণাকে বর্ণনা করার জন্য মোহনদাস গান্ধী নিযুক্ত যে বাক্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা হলো 'স্বরাজ'। বুৎপত্তিগত ভাবে স্ব + রাজ-এর এই ধারণায় হিন্দি শব্দার্থে রাজ তথা শাসনের একটি অর্থ যুক্ত হয়ে রয়েছে। প্রায় সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত অন্য বাক্যটি বুৎপত্তিগত অর্থে কিন্তু অনন্য--- স্ব+দেশ তথা 'স্বদেশ'। রাজনৈতিক ক্ষমতার শর্তহীন এই বাক্যটির ব্যঞ্জনা বোধহয় ভিন্ন। আর সেই ভিন্নতার সন্ধানে আমাদের লক্ষ করতে হবে কবি-সাহিত্যিক ও সংগীতকার রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তক রবীন্দ্রনাথের পরিণত হওয়ার ইতিহাসটিকে।

স্বরাজ-এর ভিন্নতায় স্বদেশ-এর উদ্ভাবনায় যে কবি-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ নিযুক্ত তাঁর এই উপলব্ধির ইতিহাসে ১৮৮৮ সাল গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরের সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুসমাজ' শীর্ষক একটি পাবলিক বক্তৃতা করেন; সামাজিক বিষয়ে সেই প্রথম জনসমক্ষে বক্তৃতা। হিন্দুসমাজের স্থিরাবস্থা যা তৎকালীন বঙ্গদেশের সাধারণ মতকে আকার দিচ্ছিল, এবং যা থেকে দেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উন্মেষ হচ্ছিল। হিন্দুসমাজের স্থিরাবস্থার প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীব্র সংস্কারমূলক সমালোচনা সেই সমাজ গ্রহণ করেনি এবং তার প্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে। সে সমালোচনা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আলোচিত এবং বিভিন্ন অস্বস্তিকর উল্লেখ সম্বলিত। এবং রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ যৌক্তিক অবস্থানের প্রত্যুত্তর নয় বরং বিদ্রূপ বলা যেতে পারে। ব্যক্তিগত স্তরে আক্রমণের এই পর্যায়টি যেমন রবীন্দ্রজীবনী- কারগণের ঔৎসুক্য এড়িয়ে গেছে তেমনই পরবর্তীকালে প্রায় একবছর সময় ধরে সুদূর গাজীপুরে রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতবাসের তাৎপর্যও অতিসরলীকৃত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে যে অস্থির রবীন্দ্রনাথকে আমরা আবিষ্কার করি তার তুলনায় এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে শুধু অস্থির মনে হয় না, তার প্রত্যয়ের ভিত্তি সম্বন্ধে সংশয় দেখা দেয় বলেই মনে হয়।

গাজীপুর প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যয়যুক্ত, যা তাঁর ব্যক্তিত্বে ধরা পড়েছিল তা আমরা লক্ষ করছি তাঁর রচনায়, তা ধরা পড়েছিল তাঁর স্বজনের দৃষ্টিতে। গাজীপুরবাস অন্তে রবীন্দ্রনাথ দু'টি প্রবাস বাস করেছিলেন— ইংল্যান্ডে এবং শিলাইদহে। এই প্রবাসের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের আকর্ষণের কারণ এটাই যে— রবীন্দ্রনাথের এবারের ইংল্যান্ড যাত্রার পূর্বের আগ্রহের তুলনায় ফিরে আসবার আগ্রহ, প্রকৃতপক্ষে তিনি সঙ্গীদের হতাশ করে একাই ফিরে আসেন। ফিরে আসার সময় তাঁর মনের অবস্থা প্রকাশ করেছে সুয়েজ ক্যানাল পেরোতে পেরোতে কবির লিখিত ডায়েরির এই উদ্ধৃতি—

> চমৎকার লাগছে। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্তী অপরিচিত বিস্তৃত নিভৃত ছায়াস্নিগ্ধ নদীকল-ধ্বনিযুক্ত বাংলাদেশ। আমার সেই অকর্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, আমার ভালবাসা-লালায়িত কল্পনাক্লিষ্ট যৌবন, আমার নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাশীল অতিব্যথিত জীবনের স্মৃতি

এই সূর্য্যকিরণে এই তপ্তবায়ু হিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মতো আমার স্বপ্নভারাবনত দৃষ্টির সামনে জেগে উঠছে। আমি প্রাচ্য, আমি আসিয়াবাসী, আমি বাংলার সন্তান। আমার কাছে য়ুরোপীয় সভ্যতা সমস্ত মিথ্যা— আমাকে একটি নদীতীর, একটি দিগন্তবেষ্টিত কনকসূর্য্যাস্তরঞ্জিত শস্যক্ষেত্র, একটু বিজনতা, খ্যাতিপ্রতিপত্তিহীন প্রচণ্ড প্রচেষ্টাবিহীন নিরীহ একটি জীবন এবং যথার্থ নির্জনপ্রিয় একাগ্র গভীর ভালবাসাপূর্ণ একটি হৃদয় দাও—আমি জগৎবিখ্যাত সভ্যতার গৌরব, উদ্দাম আবর্ত এবং অপর্যাপ্ত যৌবনের প্রবল উত্তেজনা চাইনে।

আমাদের দ্বিতীয় আকর্ষণের কারণ, এই যে আজন্ম নগরে প্রতিপালিত কবির মানসে ইউরোপীয় সভ্যতার আবর্ত এবং উন্মাদনার পরিবর্তে নিজের দেশ হিসাবে যন্ত্র শকটের শব্দনির্ঘোষে আকীর্ণ, পথের বাঁধানো রাস্তা, আকাশচুম্বী অট্টালিকা ও জনসমাবেশে ব্যস্ত নাগরিক জীবনের চিত্রের বদলে 'ধরাপ্রান্তবর্তী অপরিচিত বিস্তৃত নিভৃত ছায়াস্নিগ্ধ নদীকলধ্বনিযুক্ত বাংলাদেশ'-এর চিত্রই অঙ্কিত। পূর্ববঙ্গে এই প্রবাস যে চরিত্রগত ভাবে ভিন্ন এই পর্যবেক্ষণই আমাদের আকর্ষণের কারণ। হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধিত বিতর্ক, গাজীপুরবাস অন্তে রবীন্দ্রনাথকে যেন এই সময় স্থিত এবং অবস্থিত মনে হয়। বিতর্কে যে সমাজের বর্ণনা দিয়েছিলেন, যে বর্ণনা ইতিপূর্বে অস্বীকৃত, সেই বর্ণনা পুনর্বর্ণিত হয়েছে ১৯০০ সালে লিখিত 'পল্লীগ্রামে' প্রবন্ধে। তা সমাজের আকৃতি এবং সম্পর্কগুলিকে এক অনন্য যুক্তির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করছে। বলাবাহুল্য, এই বর্ণনা যে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে লেখা তা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন শিলাইদহে প্রবাসকালে।

প্রবন্ধ রচনাকালটি আমাদের আগ্রহের যোগ্য কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মোটামুটি এই সময়কালেই প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের সূত্রপাত। কিছুকাল আগেই কার্ল মার্ক্সের *ক্যাপিটাল* প্রকাশিত হলেও সমকালে তা সাধারণ ভাবে আলোচিত নয়। এ ছাড়া, ডুর্খেম বা ম্যাক্স ওয়েবার-এর প্রামাণিক রচনা তখনও প্রকাশিত হয়নি। ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের ঐতিহ্যে দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট-এর যে সম্পাদ্য প্রাথমিক ভাবে নিযুক্ত, আমরা লক্ষ করছি রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের যুক্তি রচনায় সেই একই দার্শনিক অবস্থান অবলম্বন করছেন— সমাজে, মানুষের সম্পর্কে যে সক্রিয়তা দৃশ্যমান তার নেপথ্যে এক অনিবার্য যুক্তি কাজ করছে।

সমকালীন বিশ্বে সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের সম্বন্ধ বিচারে যে সব তাত্ত্বিক মত প্রতিষ্ঠিত তা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শর্তকেই সমাজের চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করত, এই সমকালের মতোই। এই সূত্রে স্মরণ রাখা দরকার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শর্তে ইউরোপের সঙ্গে এই দেশের কাঠামোগত তফাত। উপনিবেশিত ও ঔপনিবেশিক সম্পর্ক এই কাঠামোগত সম্পর্ক এবং এই অর্থনৈতিক স্বার্থকে যে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা দিয়েছিল তা হলো, সরাসরি ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক। শিল্পায়িত অর্থনীতি উদ্ভূত পণ্যের বিপণনের শর্তে বৃহত্তর এশিয়া ও আফ্রিকাকে শিল্প-প্রস্তুত-পণ্যের বাজার হিসাবেই দেখাটাই যুক্তিযুক্ত। এই সম্পর্ক অন্যদিকে ব্রিটিশ অর্থনীতির নিয়তিকে যে চুক্তির সঙ্গে আবদ্ধ করেছিল তার প্রভাব ব্রিটেনের সমকালীন রাজনীতিতে অস্বীকার করার কোনো উপায় ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য দরকার ছিল সংসদে রাজনৈতিক সহমতের। সংসদীয় সহমতের এই গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ক্রমে ঔপনিবেশিকতা-মুক্ত এশীয় দেশগুলিতে অনুসৃত হলেও স্মরণ রাখা দরকার যে, এই সময়ে এই উপমহাদেশে সমস্ত রাষ্ট্র এই সংজ্ঞা মেনে নেয়নি এবং গণতন্ত্রের একাধিক সংজ্ঞা লক্ষ করা যাবে।

ইউরোপ সেকালের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সক্রিয়তার স্নায়ুকেন্দ্র। 'পল্লীগ্রামে'-র লেখক রবীন্দ্রনাথ এই সময়কালে ইউরোপের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্র থেকে অব্যাহতি নিয়ে, ঔপনিবেশিত ভারতের এক প্রত্যন্তে বাস করছেন। এই আবাসের বর্ণনা এক আদর্শায়িত অবস্থানের বর্ণনা, শারীরিক ভাবে স্থানান্তরের এই সময়কালে লিখিত এই প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফটি বিশিষ্ট। লেখক সাবলীল বর্ণনায় তাঁর অবস্থনের একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিচয় দিয়েছেন— 'আমি এখন বাংলাদেশের এক প্রান্তে যেখানে বাস করিতেছি এখানে কাছাকাছি কোথাও পুলিশের থানা, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি নাই।' ঔপনিবেশিত দেশ যে আইনী-আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দ্বারা শাসিত— এই বর্ণনা অনুযায়ী এই 'প্রান্ত'টি সেই শাসন-আধিপত্যের কেন্দ্র বা তার স্থানীয় প্রভাবের থেকে নিরপেক্ষ তথা স্বাধীন—'রেলোয়ে স্টেশন অনেকটা দূরে। যে পৃথিবী কেনাবেচা বাদানুবাদ মামলা-মকদ্দমা এবং আত্মগরিমার বিজ্ঞাপন প্রচার করে, কোন একটা পাকা বড়ো রাস্তার দ্বারা তাহার সহিত এই লোকালয়গুলির যোগস্থাপন হয় নাই।' কার্ল মার্ক্স ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনকে কৃষিভিত্তিক প্রাচীন সমাজের, শিল্পভিত্তিক সমাজের লক্ষ্যে প্রগতির/উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে উল্লেখযোগ্য ও ঐতিহাসিক বলে মন্তব্য করেছিলেন। প্রবন্ধকার যে লোকালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে 'রেলোয়ে স্টেশন অনেকটা দূরে।' এই প্রত্যন্ত অবস্থান, শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি, ইউরোপের শিল্পজাত পণ্যের 'আত্মগরিমার বিজ্ঞাপন' যুক্ত 'কেনাবেচার' বাজারের সঙ্গে কোনো পাকা রাস্তা দিয়ে যুক্ত নয় এবং উদাসীন। অবস্থানগত এই উদাসীনতা বা নিরপেক্ষতার বর্ণনা এক অর্থে, এক বিপরীত মেরুর চরিত্র ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশিষ্ট।

ধারণাগত ভাবে এই বৈপরীত্যের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যদি শিল্পায়িত ঔপনিবেশিক ইউরোপকে উপনিবেশিত বিশ্বের সাপেক্ষে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে সেই বিচারে অ-শিল্পায়িত উপনেবেশিত বিশ্বকে ওই ক্ষমতার পরিধিতে স্থাপন করবে। আবার, এই কাঠামোগত ভাবে বিচারে এই দেশের ঔপনিবেশিক শাসনকে ওই ক্ষমতার স্থানীয় কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই রকম বৃত্তের মধ্যে প্রবন্ধকার যে লোকালয়টির বর্ণনা দিচ্ছেন তা সেই ক্ষমতার পরিধির বাইরেই অবস্থান করছে।

এই প্রস্তাবনাটাই দেশী সমাজ সম্বন্ধে ব্যতিক্রমী। সেকালের প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্ক্স এই দেশি গ্রামসমাজকে বর্ণান্ধতা, জড়তা, কূপমণ্ডুকতার চরিত্র দিয়ে বর্ণনা করেছিলেন। এবং, এই সমাজের পরিবর্তনের পক্ষে অগ্রগতি বা উন্নয়নের সওয়াল করেছিলেন। ভারতীয় গ্রামসমাজ সম্বন্ধে একই পর্যবেক্ষণ সমকালীন ঔপনিবেশিক প্রশাসকের দলিলেও উপস্থিত। এই পর্যবেক্ষণে দেশি গ্রামসমাজের সরল অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতির একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির উল্লেখ করা হয়েছে; এই সুস্থিরতাকেই এশিয়াটিক সমাজের অন্যতম চরিত্র হিসাবে লক্ষ করা হয়েছে। রাজ্য ও রাজবংশের নিরবিচ্ছিন্ন ভাঙাগড়ার মধ্যে এই সমাজের নিশ্চলতা এবং স্থিরতা যে কোনো পরিবর্তনকে প্রতিহত করে। কোনো রাষ্ট্রিক পরিবর্তন এই

সুস্থিরতাকে বিচলিত করতে পারে না। প্রাচ্যবাদী এই বয়ানে কোনো প্রাচ্যদেশীয় মত শোনা যায় নি। এই তথ্যটা আধুনিক ঔপনিবেশিকতা চর্চার অনুসন্ধানের বিষয়, এবং সেই আগ্রহ থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্যসমাজ সম্বন্ধে মন্তব্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

প্রাচ্যসমাজ সম্বন্ধে, পাশ্চাত্যের মনীষা যে প্রতিমা গড়ে তুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই প্রতিমার বিনির্মাণ করে সুস্থির গ্রামসমাজকে দেশি সমাজের কেন্দ্রে স্থাপন করে যে ব্যতিক্রমী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তা গ্রামসমাজের সুস্থিরতা এবং পুনর্নির্মিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে শুধু অভিনন্দিত করে না তা সমকালীন শিল্পোন্নত দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পাদ্যটিকেও প্রশ্ন করে। এই মন্তব্যটি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে চালিত জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনকে তাত্ত্বিক তাৎপর্য দিয়েছিল— এ তথ্যটি বহু আলোচিত হলেও এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্ভবত আলোচনার বাইরেই রয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গটি পরে আলোচিত হবে তবে এই সুযোগে শের-ই-বঙ্গাল জনাব ফজলুল হকের উল্লেখ প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে দেশজোড়া জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পাশাপাশি প্রজা কৃষক সমিতির আঞ্চলিক রাজনীতির উত্থানের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও তার বিবর্তনের ইতিহাস এখনও যথেষ্ট সন্ধান করা হয়নি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সাংবিধানিক ভারতীয় রাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথ উত্থাপিত দেশি সমাজ সম্বন্ধে এই প্রশ্নটির নিষ্পত্তি হয়েছে এমন বলা যাবে না বোধহয়। গ্রাম-শহরের প্রসঙ্গে কেন্দ্র-পরিধির এই প্রশ্ন সমকালেও সমান ভাবে সজীব। সংবিধান সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন এই দেশী সমাজ যে আধুনিক কালেও তার স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত সেই সংবাদটি আমাদের অপরিচিত নয় এবং তাই-ই এই উপমহাদেশের সমাজের স্থায়ী চরিত্র। গত কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যখনই সাংবিধানিক রাষ্ট্র শিল্পায়নের প্রস্তাব করেছে, গ্রামসমাজ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এই বিশিষ্ট প্রেক্ষিতে সমকালেও দেশের রাজনীতি নগর-কেন্দ্রিকতা এবং গ্রাম-কেন্দ্রিকতার প্রশ্নে ওই বৃত্ত ও পরিধির প্রশ্নে দ্বিধান্বিত। গ্রাম-নগরের এই বিতর্কে সমাধানের দায় শেষপর্যন্ত কল্যাণকামী রাষ্ট্রেরই এবং রাষ্ট্রের ধারণা নগর ও গ্রাম সমাজকে ভিন্নতায় বিচার করে না। ফলে বিতর্কটা এসে যায়, রাষ্ট্রের ধারণায় গ্রাম অথবা নগরসমাজের মধ্যে কোন্ সমাজকে কেন্দ্রে আর কোন্ সমাজকে পরিধিতে স্থাপন করা হবে সেই প্রশ্নে। এশীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা যে সমস্ত প্রশ্নের সন্ধান করেছে তার মধ্যে এই এক প্রশ্ন অতিমাত্রায় সজীব। নগর-গ্রামের এই বিতর্কে বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিবিদ জয়প্রকাশ নারায়ণ লক্ষ্য করেছিলেন—

> One concept is that [...] [was] accepted as the basis of the Constitution, namely, the atomised and inorganic view of society. It is this view that governs political theory and practices in the West today. [...] Political theory and practice naturally reflect this state of affairs, and political democracy is reduced to counting of heads. It is further natural in these circumstances for political parties, built around competing power-groups, to be formed, leading to establishment, not of government by people, but of government by party; in other words, by one or another power group. The other is the organic or communitarian view that puts man in this natural milieu as a responsible community. [...] It is natural that in this view the emphasis should be laid more on responsibility than the right, just in the inorganic view it is natural that it should be the opposite. When the individual lives in community with others, his rights flow from his responsibilities.

জয়প্রকাশের এই মন্তব্য রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ককে যে ব্যঞ্জনার ভিন্নতায় প্রকাশ করছে সেই ব্যঞ্জনায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা-কালীন ভাষণে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এই প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের সাংবিধানিক রাষ্ট্রিক সমাজের রাষ্ট্র ও ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কের মধ্যে সমাজকে স্থাপন করেছেন, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিমানুষের অন্তর্বর্তী হিসাবে। যে 'অন্তর্বর্তী' রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের আলোড়নকে নিজস্ব সুস্থিরতায় প্রশমিত করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে দিকনির্দেশ করবে। কাঠামোগত ভাবে, এই ব্যবস্থা পাশ্চাত্য-সুলভ রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তিমানুষে প্রবাহিত সক্রিয়তার পরিবর্তে যেমন ব্যক্তিমানুষ থেকে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় প্রবাহিত তেমনই এই প্রস্তাব ব্যক্তিমানুষকে সরাসরি রাষ্ট্রিক ক্ষমতার আওতার বাইরেই রাখছে। রবীন্দ্রনাথ, এই প্রসঙ্গটিকে বয়ান করেছেন তাঁর নাটকের সংলাপে।

> ৩ ।। ঠাট্টা করছ ঠাকুর?
>
> ধনঞ্জয় ।। ঠাট্টা কেন করব? সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী? (...) একপায়ে চলার মতো কি দুঃখ আছে? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তা হলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে।

এই সংলাপ থেকে যে সূত্রটি নিষ্কাশন করা যেতে পারে, তা হলো— প্রজা যদি একপক্ষ হয় তাহলে অন্যপক্ষ অর্থাৎ রাজা তথা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দুয়ে মিলে ধারণাগত ভাবে দু'টি ভিন্ন অস্তিত্ব এবং একে অন্যের সম্মতির দ্বারা পরিপূরক। প্রথমটি যদি সমাজ হয় তাহলে দ্বিতীয়টি রাষ্ট্র।

> ৩ ।। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলবো?
>
> ধনঞ্জয় ।। বলব, যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই— কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।
>
> (*মুক্তধারা*।)
>
> প্রতাপাদিত্য ।। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকী—দেবে কিনা বলো।
>
> ধনঞ্জয় ।। না মহারাজ দেব না। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ তোমাকে দিই কী বলে?
>
> (*প্রায়শ্চিত্ত*।)

সংলাপে, ব্যক্তিমানুষের অধিকারকে রাষ্ট্রিক অধিকারের আওতার বাইরে শুধু রাখছে না, উৎপাদন এবং উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে যে নির্দিষ্ট বয়ান করছে তা অনুধাবনীয়।

এ যাবৎ আলোচনায় লক্ষ করা যাবে যে, সামাজিক বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর শব্দার্থ লক্ষণীয় ভাবে ব্যবহার করেননি, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সূত্র এবং প্রাসঙ্গিক শ্রেণিতত্ত্ব; এই বিচ্যুতি অজ্ঞতা-প্রসূত হতে পারে, আবার উদাসীনতা হতে পারে। এই বিষয়ে ভিন্ন পরিসরে বিশদ আলোচনা হতে পারে,

আপাতত আমরা লক্ষ করব, ঠাণ্ডাযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীতে শ্রেণিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহের কথা আড়ালে-আবডালে শোনা যাচ্ছিল, আজ তা এই সময়ে উচ্চস্বরে শোনা যাচ্ছে। বিগত শতাব্দীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রধান ভাষ্য শ্রেণিতত্ত্ব এই শতাব্দীতে তেমন শোনা না গেলেও, যে বিষয়গুলি প্রায় রাজনৈতিক প্রস্তাবের দাবিতে উত্থিত তা হলো— মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ, নারীর আত্মপরিচিতি এবং পরিবেশ বিপর্যয়। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্ররচনায় এই সব প্রসঙ্গ প্রাথমিক ভাবে সাধারণ নৈতিক শর্তেই উত্থিত। সেই শর্ত কোনো সমাজ বা ব্যক্তিমানুষের ব্যাখ্যা দ্বারা আরোপিত নয় বরং মানুষের ধর্মের ইতিহাসের ধারা থেকেই নিষ্কাষিত।

রাষ্ট্রের সাপেক্ষে সার্বভৌম এবং স্বনির্ভর এই সমাজ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন পূর্ববঙ্গের গ্রামে। এমন মনে করার কারণ, বাংলার গ্রামের যে অন্তরঙ্গ মুখ তিনি দেখেছিলেন, তা ঐতিহাসিক ভাবে পূর্ববঙ্গেরই। এই গ্রামসমাজে যে-ভারতকে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন তাকেই দেশি সমাজের একক হিসাবেই নির্দিষ্ট করেছিলেন। আর সেই সূত্রে কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রের সঙ্গে সংলাপে এই দেশি সমাজকে আত্মনির্ভর দেখতে চাওয়ার ব্রতেই রবীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি'র উদ্বোধনের আহ্বান করেছিলেন। আত্মশক্তি-যুক্ত সমাজই রাষ্ট্র কাঠামোকে শক্তিমান করবে তার সমালোচক ভূমিকা পরিহার না করেই, এমন একটি প্রকল্প এক অর্থে আধুনিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। আকারগত ভাবে, রাষ্ট্রের ধারণায় সমাজকে যদি একটি ত্রিভুজের চেহারায় দেখি এবং সমাজকে যদি ভূমিতে স্থাপন করা যায়, তাহলে, পাশ্চাত্যের ধারণায় আধুনিক রাষ্ট্রের গড়ন হবে সাধারণ ত্রিভুজের মতো, যার শীর্ষে রইবে রাষ্ট্র ক্ষমতা ; এর বিপরীতে যে ত্রিভুজের প্রকল্প রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করছেন তা উল্টানো ত্রিভুজ। সমাজ ও রাষ্ট্রের এই বয়ানেই গ্রাম-নগরের সম্পর্কের যে সমীকরণ তার মধ্যেই বিশ্বায়ন ও স্থানীয়তার একটি সমীকরণ রয়েছে। এই সমীকরণে দুইপক্ষকে যে বিরোধাভাষে স্থাপন করার দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমরা পরিচিত এবং সেই পরিচিতি থেকেই রবীন্দ্রনাথ পুনরাবিষ্কার করা হলেও এই সমীকরণে রবীন্দ্রনাথ যে শর্ত আরোপ করেছেন তা স্পষ্টত ব্যতিক্রমী এবং মীমাংসামূলক। একই সময়ে লিখিত প্রবন্ধ 'আদিম সম্বল'-এর শেষ পরিচ্ছেদটি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

> আমি পল্লীপ্রান্তে বসিয়া আমার সাধাসিধা তানপুরার চারটি তারের গুটি-চারেক সুন্দর সুরসম্মিশ্রণের সহিত মিলাইয়া য়ুরোপীয় সভ্যতাকে বলিতেছি 'তোমার সুর এখনো ঠিক মিলিল না' এবং তানপুরাটিকেও বলিতে হয়, 'তোমার ঐ গুটিকয়েক সুরের পুনঃপুন ঝংকারকেও পরিপূর্ণ সংগীত জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। বরঞ্চ আজিকার বিশৃঙ্খল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহাসংগীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু হায়, তোমার ঐ কয়েকটি তারের মধ্য হইতে মহৎ মূর্তিমান সংগীত বাহির করা প্রতিভার পক্ষেও দুঃসাধ্য।

একুশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবোত্তর বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতির যে আধুনিকতা আবিষ্কার করছে তারই সূত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে বিগত শতাব্দীর ব্যতিক্রমী, স্বল্পশ্রুত প্রস্তাবের পুনর্ধ্যয়ন। পুনর্ধ্যয়নের এই আগ্রহই রবীন্দ্রনাথের ১৫০তম জন্মদিন উদযাপনের অনিবার্যতা আবিষ্কারে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে।

২

উপনিবেশিত ভারতের মূল রাজনৈতিক স্রোতের সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন প্রান্তবাসীই থেকেছেন। সমাজ ও তার বিন্যাস সম্বন্ধে তাঁর স্বকীয় স্বতন্ত্রতায় যে প্রায়োগিক প্রসারণ করেছিলেন তাকে সাধারণত 'এক্সপেরিমেন্ট' হিসাবে অধ্যয়ন করা হলেও অধ্যাপক আনিসুর রহমান এই উদ্যোগকে Action Research হিসাবে লক্ষ করেছেন। উল্লেখ থাকে যে, এক্সপেরিমেন্ট শব্দটি প্রায়োগিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে আহরিত এবং Action Research শব্দটি সামাজিক বিজ্ঞানের পরিধি থেকে আহরিত। সংজ্ঞাগত ভাবে ফলিত স্তরে Action Research -এ গবেষণার গন্তব্যকে অনুসন্ধানের ফল ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করতে থাকে, গন্তব্যের দিক ও মান পরিবর্তিত করতে থাকে। পদ্ধতিগত ভাবে, এক্সপেরিমেন্ট পূর্বনির্ধারিত গন্তব্য দ্বারা পরিচালিত ও নির্ধারিত। অধ্যাপক রহমান, Action Research-এর একটি পরিভাষা স্থির করেছেন— গণ-গবেষণা। এই অধ্যয়ন, রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার ফলিত প্রয়োগকে গণ-গবেষণার ফলাফল হিসাবেই অনুধাবন করছে।

সেরেস্তার উল্লেখ অনুযায়ী কলকাতার ঠাকুর পারিবারিক জমিদারির পরিদর্শক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন বঙ্গদেশের পূর্বভাগে অবস্থান কালে নিজস্ব এলাকায় যে সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাই আমাদের অধ্যয়নের বিষয়। এই বিষয়ে যা আমাদের প্রাথমিক ভাবে আকর্ষণ করে তা হলো, প্রধানত গ্রামীণ এলাকায় সংস্কারের প্রয়োজনের উপলব্ধির প্রসঙ্গ। (কাঙাল) হরিনাথ মজুমদারের *পল্লীবার্তা*-য় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এই এলাকায় জমিদার-রায়তের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে বয়ান পাওয়া যায় তার সাপেক্ষে এই সংস্কারের উদ্যোগ অনিবার্য অর্থেই ব্যতিক্রমী। বিরাহিমপুর পরগণার আটটি ডিহি কাছারি ভেঙে শিলাইদহ সদর বাদে যে চারটি মণ্ডলী যথা— জানিপুর-বনগ্রাম, কুমারখালি-পাণ্ঠি, কয়া-কালোয়া ও সদিরাজপুর-রাধাকান্তপুর গঠন করা হয় রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমূলক উদ্যোগ মূলত এই এলাকাতেই সংগঠিত হয়েছিল। এই সব মণ্ডলীতে বেতনভুক অধ্যক্ষের নেতৃত্বে দু'জন হিন্দু ও দু'জন মুসলমান সভ্য নিয়ে গ্রামসমিতি গঠিত হয়েছিল। সপ্তাহে একবার থেকে দু'বার মিলিত হয়ে এঁরাই কর্মবিধি পরিচালনা করতেন। এই সমস্ত এলাকায় মুষ্টিভিক্ষা ছাড়া প্রজাদের খাজনার উপর টাকায় তিন পয়সা 'কল্যাণ বৃত্তি' ধার্য হতো। এর ফলে যে অর্থ জমা হতো, জমিদারি তহবিল থেকে তার সমপরিমাণ বা তার বেশি অর্থ অনুদান হিসাবে দেওয়া হতো। এই গ্রাম সুহৃদ সমিতির তত্ত্বাবধানে এই অর্থের ব্যবহারে রাস্তাঘাট তৈরি, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসালয় ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। তথ্যগত ভাবে এই সব সংবাদের সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত কিন্তু এরই নেপথ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মানসে যে সক্রিয়তা চলছিল তার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্নজনকে লিখিত পত্রে। আমরা সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করব, তাঁর এই গণ-গবেষণাকে অধ্যয়ন করবার জন্য।

অধ্যাপক আনিসুর রহমান, রবীন্দ্রনাথকে অসফল উজ্জীবক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই উল্লেখ স্বয়ং স্বীকার করেছেন; ২৮ মার্চ ১৯১৫ সালে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর তৃতীয় সভায় রবীন্দ্রনাথ শ্রোতাদের সম্বোধন করে বলেন— 'আমি সশরীরে এ কাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারিনি, কারণ আমি আমার অযোগ্যতা জানি। আমার মনে এদের প্রতি অবজ্ঞা নেই, কিন্তু আমার আজন্মকালের শিক্ষা ও অভ্যাস আমার প্রতিকূল।'

গ্রামোন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংক্রান্ত

আলোচনায় সচরাচর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অংশগ্রহণই উল্লেখিত হয়ে থাকে, তেমন সম্ভাবনা এইক্ষেত্রে খুব একটা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। সহৃদয় জমিদার হিসাবে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা অবশ্যই ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করে কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগের বাইরে গ্রাম উন্নয়ন সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা এই সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্যের ভারে বোধহয় লক্ষ্য করা যায় না; বরং হারিয়ে যায়। গ্রামোন্নয়নের প্রসঙ্গে তাঁর অনন্যতা সম্ভবত তাঁর ভাবনার স্তরেই নিহিত, এই ভাবনার বোধহয় একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও সম্ভব যা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। সশরীরে প্রবেশ না করলেও এই বিষয়ে তাঁর গন্তব্যের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে ২ মার্চ ১৯০৮ সালে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রে।

> [এই বিষয়ে] প্রথম ও প্রধান বাধাই হচ্ছে মানুষের প্রতিকূলতা। একবার বিশ্বাস পেলে তারপরেই সব কাজই সহজ হবে। অবশ্য অনেকগুলি সুবিধা আছে—আমি জমিদার বলে একটা সুবিধা। আর্থিক সুবিধাও কম নয়। কিন্তু এই রকম বাহ্য সুবিধাগুলো যথার্থ সুবিধা কিনা সন্দেহ। এতে অনেক মিথ্যা ভিতরে থেকে যায়। সত্যকার বাধাকে সত্যকার কষ্ট দিয়ে কাটালে তবেই সত্যকার ফল পাওয়া যায়। কাজকেও কিছুদূর পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে তার পরে একেও আমার বিরুদ্ধে স্বাধীন করে দিতে পারলে তবেই এর জোর বাড়বে। যতদিন পর্যন্ত ভূপেশরা আমাদের লোক ততদিন পর্যন্ত একাজের সম্পূর্ণ শক্তির স্ফূর্তি হবে না। **অতএব একদিন গাছে চড়িয়ে দিয়ে এদেরই মই কেড়ে নিতে হবে—নইলে এরা সম্পূর্ণ গাছের হবে না—নীচের দিকে কেবলি দৃষ্টি দেবে।** যাই হোক, যেমন করেই হোক, কাজটাকে ঘটিয়ে তুলতে হবে। গ্রামগুলিকে স্বাধীন করে দিয়ে এদের মনুষ্যত্ব জাগাতেই হবে। গ্রামের সমস্ত লোক এক হয়ে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবে তারই উদ্যোগ করা যাচ্চে। আজ থেকে এদের প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে একটা করে হাঁড়ি দেওয়া হয়েছে— তারা মুষ্টিভিক্ষা দেবে— সেই মুষ্টিভিক্ষায় ওদের পাঠশালার খরচ চালাতে হবে। যদি ভিক্ষায় দশ টাকা ওঠে এবং আমি পাঁচ টাকা দিই তাহলে ১৫ টাকায় একজন শিক্ষক জোগাড় করা যাবে— এখানকার একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে খেয়ে ও থেকে তিনি গ্রামটাকে ভিতর থেকে গড়ে তুলবেন।

প্রসঙ্গত এই একই সময়ে শান্তিনিকেতনে যে বিদ্যালয়টি চলছিল, সেখানে শিক্ষকদের বেতন ছিল কমবেশি ২০ টাকা, মোটামুটি অন্যত্রও শিক্ষকের বেতনের হার ওই একই ছিল। এই হিসাব, যেমন ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের ভাবনার স্বকীয়তার পরিচয় তেমনই—'একেও আমার বিরুদ্ধে স্বাধীন করে দিতে পারলে' মন্তব্যটির মধ্যেই বোধহয় চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথ নিহিত। স্তরে বিন্যস্ত গ্রামের উন্নয়নের সঙ্গে যে ভাবে গ্রামের অর্থনীতি এবং রাজনীতি জড়িয়ে আছে তার বর্ণনায় 'আমার' তথা ভূ-মধ্যাধিকারী গোষ্ঠী সম্বন্ধে তাঁর মতামত বেশ স্পষ্ট। সমাজ পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া রাজনৈতিক সক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত তা এক অর্থে 'অন্তর্ঘাত'-মূলক। সাাবেকি সমাজে বাস করেই সেই সমাজকে পরিবর্তিত করবার মোক্ষম উপায়, সেই সমাজের ইতিহাস থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে সেই সমাজের অন্তর্নিহিত সমসাময়িকতার সাপেক্ষে পুনর্বিচার। দেশি সমাজ সম্বন্ধে পুনর্বিচারের যে বয়ান রবীন্দ্রনাথ রচনা করছিলেন তারই ইঙ্গিতবাহী এই বাক্যবন্ধ; সাবেকি রীতিব্যবস্থার বিপরীতে যাওয়ার ব্যঞ্জনাবাহী এই মন্তব্য অন্তর্ঘাতমূলক।

গ্রামের পুনর্জীবনের এই উদ্যোগের সাফল্য নির্ণয়ে স্বাভাবিক ভাবেই যে সমস্ত সূচক বিশেষ করে অর্থনৈতিক পরিকল্প যে ধরণের সূচক চিহ্নিত করে, তার বিচারে এই উদ্যোগের সাফল্য সন্ধান করতে গেলে অর্থাৎ সংখ্যাগত পরিসংখ্যান খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক হবে বলে মনে হবে না। আত্মশক্তির উদ্বোধনের যে সংকল্প রবীন্দ্রনাথ এই সব গ্রামে গ্রহণ করেছিলেন, পরিবর্তনের গুণগত হিসাব বরং তার সন্ধান দেবে। আত্মশক্তির উদ্বোধনে তিনি বোধহয় সমাজের ক্ষমতার বিন্যাসকে পুনর্গঠনেই উদ্যোগী ছিলেন। পুনর্গঠনের এই উদ্যোগ যে সব কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করেছিল তার একটা বয়ান বিভিন্ন নথি থেকে পাওয়া যায়। তবে, সেই সমস্ত বয়ান পথেরই বর্ণনা, গন্তব্যের পরিচিতি নয়। এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত বিদ্যালয়, অবৈতনিক চিকিৎসালয়, পুকুর সংস্কারের উদ্যোগের সম্বন্ধে জানা যায় তার সংখ্যাগত পরিসংখ্যান থেকে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যাবে না, প্রথমত, বিশদ তথ্যের অভাবে এবং দ্বিতীয়ত, সেই উদ্যোগের প্রভাব কি ভাবে সেই গ্রাম-সমাজে পড়েছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যের অভাবে। এইখানে ১৪ জুলাই ১৯০৮, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি চিঠির অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে যা এই উদ্যোগের সাংগঠনিক বিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা দিতে পারে।

> আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজের পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগণাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে একজন করে অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেচি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে— পথঘাট সংস্কার করে, জল কষ্ট দূর করে, শালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা গিয়েছে।

উল্লেখিত উদ্যোগ, গ্রাম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য তার সাফল্যও গ্রামসমাজের উদ্বুদ্ধ হওয়ার মধ্যেই। তবে তার জন্য গ্রামসমাজের সামূহিক আগ্রহের ভূমিকাই প্রাথমিক, এক্ষেত্রে যিনি উদ্যোগপতি তাঁর ভূমিকা গৌণ। উল্লেখ্য, গ্রাম-সমাজের সাবেকি ব্যবস্থায় এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের শীর্ষে যিনি ব্যক্তিগত ভাবে থাকেন তিনি হলেন গ্রামের জমিদার। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় এই কর্মকাণ্ডে গ্রামের অধ্যক্ষই মুখ্য। সমসাময়িক গ্রাম-প্রশাসনের সূত্রে বিচার করলে বোধহয় বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা যাবে। স্বাধীন ভারত বা বাঙলাদেশের গ্রাম- প্রশাসনের বর্তমান বন্দোবস্ত বিচার করল এই ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকতার যে প্রেক্ষিত ধরা পড়বে, তার সাপেক্ষে ঔপনিবেশিক কালে প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থাকে শুধু অভিনব হিসাবে লক্ষ করলে বোধহয় চলবে না। এই প্রস্তাবের মধ্যে কি স্বাধীন দেশের গ্রামীণ-প্রশাসনের ভবিষ্যৎ নিহিত ছিল— যে সম্ভাবনা পরবর্তীকালে দেশের সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে। বলাবাহুল্য, সেই সময়ে এই ব্যবস্থা শুধু অভিনব ছিল না, তৎকালীন সময়ের বিচারে এবং বাকি পৃথিবীর গ্রামীণ সমাজের প্রশাসন ব্যবস্থার সাপেক্ষে অনন্য ছিল। এই ব্যবস্থার সঙ্গে যদি সোভিয়েত রাশিয়ার তুলনা করতে হয় তাহলে মনে রাখতে হবে, সে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আরও প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে। ইউরোপের এবং এশিয়ার

বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে কিন্তু ভূ-মধ্যাধিকারীর দ্বারা প্রশাসিত হতো। গ্রামসমাজের পুনর্গঠনের এই অনন্য ভাবনা, বাঙলাদেশেই প্রথম নিয়োজিত— এই বিষয়ে খুব বেশি দ্বিমত হওয়া যাবে না। প্রশ্ন জাগে, পূর্ব বাঙলার সেই সমস্ত গ্রামের বাইরে অন্যত্র এই অভিনবত্ব কি ভাবে সাড়া দিয়েছিল, অন্যান্য জমিদাররাই বা কি ভাবে এই উদ্যোগকে লক্ষ করছিলেন? জমিদার কবি রবীন্দ্রনাথের এই উদ্যোগকে গ্রামবাসীরাই বা কী ভাবে দেখেছিলেন? একটা সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথেরই পত্রে— 'আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ হচ্চে—হিন্দু পল্লীতে বাধার অন্ত নেই।' (প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯।)

আগের দীর্ঘ আলোচনায়, রাষ্ট্র, ব্যক্তি এবং সমষ্টির মধ্যে যে সম্পর্ক বিচার করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গটি মনে রেখে এই উদ্যোগের সাফল্যের বিষয়টি বিচার করল বোধহয় বিচারটি ন্যায্য হবে। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গটিই উল্লেখ করেছেন চিঠিতে—

> কাজকেও কিছুদূর পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে তারপরে **একেও আমার বিরুদ্ধে স্বাধীন করে দিতে পারলে তবেই এর জোর বাড়বে**। [...] যেমন করেই হোক, গ্রামগুলিকে স্বাধীন করে [...] এদের মনুষত্ব জাগাতে হবেই হবে। গ্রামের সমস্ত কাজ গ্রামের সমস্ত লোক এক হয়ে সম্পন্ন করবে তারই উদোগ করা যাচ্চে।

মোটা হরফে উল্লেখিত বাক্যটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রবীন্দ্রনাথ সেই হিসাবে স্থানীয় জমিদার, ভূ-সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী। ভূ-স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে সেই অর্থে প্রজাদের স্বাধীন করে দেওয়ার এই ইচ্ছা স্পষ্টত অন্তর্ঘাতের অভিসন্ধিমূলক। ভূমি এবং ভূ-মধ্যাধিকারীর সেই ভূমি থেকে খাজনা আদায়ের মধ্যে দিয়ে যে প্রজা-জমিদার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, শাসক-শাসিতের সেই সম্পর্ককে পরিবর্তিত করতে 'আমার বিরুদ্ধে স্বাধীন করে' দেওয়ার উদ্যোগ যথার্থ কারণেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই উদ্যোগের সামাজিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে। সমাজের পুনর্গঠনের যে রাবীন্দ্রিক চিন্তা সচরাচর আলোচিত তার কেন্দ্রে রয়েছে 'আত্মশক্তি'র একটি ধারণা। ঔপনিবেশিক শাসনের সাপেক্ষে এই অভিধাটির যে অনুজ্ঞা ঔপনিবেশিক-বিরোধী অর্থে প্রযোজ্য তাই আবার ঔপনিবেশিকতা-উত্তর পরিস্থিতিতে এক বিশিষ্ট অর্থ ধারণ করে। বিশেষ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের যে সহবাসী অবস্থানের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বয়ান করেছেন, তার সাপেক্ষে। সমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের এই সক্ষমতারই রাষ্ট্র ক্ষমতাকে শক্তি জোগাবার কথা, কিন্তু রাষ্ট্রের আধুনিক ধারণায় বিষয়টি উল্‌টো। পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উদ্যোগের রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা বিশেষ আলোচিত হয়নি। এই উদ্যোগ, যদি কোনো স্থায়ী পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে যা পরবর্তীকালে এই ভূ-খণ্ডের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেই প্রসঙ্গটি থেকেই যায়। বিশেষ করে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ, যা বর্তমান বাঙলাদেশের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ চরিত্র।

ঔপনিবেশিক ভারতীয় ভূ-খণ্ডের জাতীয়তা-বাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়ার দিকে, প্রজা-কৃষক পার্টির উত্থানের যে বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে, তা মূলত জনাব ফজলুল হকের উত্থানের বিবরণ। সেই বিবরণ থেকে বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে ফজলুল হক যেমন দুর্বোধ্য, তেমনই দুর্বোধ্য প্রজা-কৃষক পার্টির প্রতি জন-সমর্থনের ভিত্তি। প্রজা-কৃষক পার্টির অন্যতম দাবি ছিল কৃষকের জমির অধিকার। এই দাবিই, একদিকে যেমন পার্টির প্রতি সাধারণ জন-সমর্থন গড়ে তুলেছিল, তেমনই এই দাবির ফলেই মূলস্রোত জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সমর্থন ভূ-স্বত্বাধিকারীদের সমর্থন হারিয়েছিল। প্রজা-কৃষক পার্টির যে কর্মসূচি এবং দাবিপত্র পাওয়া যাচ্ছে, তা একটু বিচিত্র। বিচিত্র, কারণ একটি মাত্র প্রদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের যে দাবি তা স্পষ্টতই মূলস্রোত রাজনীতি থেকে ভিন্ন। (এই ভূখণ্ডের ইতিহাসে, পরবর্তীকালে প্রাদেশিক এই রাজনৈতিক দাবি ক্রমশ মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব হারিয়েছিল।)

আত্ম- নিয়ন্ত্রণের যে গণ-গবেষণা রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন, তার কোনো প্রভাব এই ভূ-খণ্ডের সামাজিক ইতিহাসে পড়েছিল কিনা, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিনি। বিষয়টিকে ভিন্ন ভাবে দেখলে, আত্মনিয়ন্ত্রণ এই ভূ-খণ্ডের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে, যা রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন। তেমনটা হলে, রবীন্দ্রনাথের সমাজ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক নির্মাণে পূর্ববঙ্গের সমাজের ভূমিকার একটি স্পষ্ট আকার পাওয়া যাবে।

৩

ব্যক্তিগত স্তরে, এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। আলোচ্যকালে এই বিদ্যালয়, শিক্ষার যে ব্যতিক্রমী পথ আবিষ্কার করছিল তার বিবরণ এই পরিসরে সম্ভব নয়। (বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের *শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যকথা*, আনন্দ, ২০০৮।) ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও তার পুনর্গঠন সম্বন্ধে অন্য একটি দিক দৃষ্টিগোচর হয়— বিদ্যালয়ের কার্যভার থেকে অব্যাহতি নিয়ে শিলাইদহবাসী 'জমিদার' রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে এক চিঠিতে (১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮) লিখছেন—

> আমার হৃদয়ের মধ্যে একটি ব্যাকলুতা অনুভব করিতেছি— তাহার একটা কিনারা না করিয়া আমি কিছুতে মন দিতে পারিব না। আমার বাহিরের সমস্ত কাজকর্মের ভিতর হইতে একটা বেদনার তাগিদ আসিতেছে—আমাকে আমার অন্তরাত্মা ভারি একটা তাড়া লাগাইতেছে। অতএব দয়া করিয়া আপনারা আমার ছুটি বাড়াইয়া দিবেন।' (প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত।)

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড বিষয়ক ব্যস্ততার মধ্যেই কবি রবীন্দ্রনাথের পল্লী গঠনের কর্মকাণ্ডে দীর্ঘ সময় ধরেই সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিঠিতে এবং অন্যান্যদের বিবৃতিতে তার একটা চিত্তাকর্ষক বিবরণও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্ত কুমার পাল জানাচ্ছেন,

> রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শিলাইদহ গ্রাম-পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করেন। প্রবীণ ম্যানেজার বামাচরণ বসুর স্থানে বিপিনবিহারী বিশ্বাস বিএল নিযুক্ত হন বৈশাখ ১৩১৪ থেকে। উৎসাহী ও কর্মদক্ষ এই ম্যানেজারের সাহায্য রবীন্দ্রনাথের কাজ সহজ করে দিয়েছিল। বিরাহিমপুর পরগণার আটটি ডিহি কাছারি ভেঙে শিলাইদহ সদর বাদে চারটি মণ্ডলী (বিভাগীয় কাছারি) গঠন করা হয় জানিপুর-বনগ্রাম, কুমারখালি-পাঠি, কয়া-কালোয়া ও সদিরাজপুর- রাধাকান্তপুর— অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন যথাক্রমে নলিনী চক্রবর্তী, ভূপেশচন্দ্র রায়, রতিকান্ত দাস ও সতীশচন্দ্র ঘোষ। মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া প্রজাদের খাজনার উপর টাকায়

তিন পয়সা হিসাবে 'কল্যাণ বৃত্তি' ধার্য হয়— জমিদার সমপরিমাণ বা তার বেশি টাকা দিতেন। প্রতি মণ্ডলীতে অধ্যক্ষ বাদে দু'জন হিন্দু ও দু'জন মুসলমান সভ্য নিযুক্ত হতেন। প্রথমে সপ্তাহে দু'বার ও পরে একবার করে এঁরা মিলিত হয়ে কর্মবিধি পরিচালনা করতেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে, রবীন্দ্রনাথ যাকে অন্যত্র রাষ্ট্রনীতি হিসাবে অভিহিত করেছেন, সেই রাজনীতির সন্নিকর্ষে এসেছিলেন। কবির গান, সেই আন্দোলিত ক্ষোভকে ভাষা দিয়েছিল। কবি পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যুক্ত হওয়া সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সামাজিক ইতিহাসকার রামচন্দ্র গুহ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-উত্তর রবীন্দ্রনাথকে *ঘরে বাইরে*-র নিখিলেশের সঙ্গে তুলনা করেছেন, বিশেষ করে উপন্যাসের অন্তিমে যে প্রায় মৃত নিখিলেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সময়েই কবি রবীন্দ্রনাথ নগরবাসী তরুণ ও যুবাবর্গকে দেশের গ্রামীণ সমাজ আবিষ্কার করবার যে আহ্বান করেছিলেন, সে আহ্বান স্বদেশি সমাজকে পুনরাবিষ্কারের আহ্বান। এই প্রস্তাবের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কবি ইতিমধ্যেই সমাধা করেছেন, আর সেই বিশ্লেষণের সাপেক্ষে এই আহ্বানকে শুধুমাত্র গ্রাম পুনর্গঠনের আহ্বান বলা যায় না হয়তো, কারণ এই আহ্বানের মধ্যে নগর ও গ্রামের যে সমীকরণের সূত্র মূলস্রোত রাজনীতিকে তাত্ত্বিক স্তরে পরিচালিত করছিল সেই সমীকরণটিকে বিপরীত দিক থেকে সমাধা করার প্রস্তাব ছিল। রবীন্দ্রজীবনীকার জানাচ্ছেন, এই সময়ের কিছুকাল পর থেকে বাংলার গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত নগরবাসী যুবককে কাঁধে ঝোলা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত তারা ওই আহ্বানে সাড়া দিয়ে গ্রামসমাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিল।

এইখানে, 'জমিদারি'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গটি একবার বুঝে নেওয়া দরকার। দ্বারকানাথ ঠাকুর, স্ব-ক্ষমতায় যে ভূ- সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন তা বিস্তৃত ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আসাম এবং ওড়িশা পর্যন্ত। তাঁর জীবৎকালের পরে এই ভূ-সম্পত্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি একটি ট্রাস্ট গঠন করেন এবং সেই ট্রাস্টের হাতেই সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করেন। ট্রাস্ট সম্পত্তির দেখাশোনা করত এবং সেই উপার্জনের অংশ পেতেন পুত্র দেবেন্দ্রনাথ। পরে, দেবেন্দ্রনাথ আদালতের মাধ্যমে নিজেই এই সম্পত্তির দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের আমলে, জমিদারি আকারে বাড়েনি বটে তবে ভাগাভাগি হয়েছে; কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের অংশের দায়িত্ব দেবেন্দ্রনাথ বহন করেছেন। পরে যখন একান্নবর্তী পরিবারের সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা হয় তখন মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে পাবনার সাজাদপুর পরগনা। গিরীন্দ্রনাথের পর তাঁর দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ মারা গেলে গুণেন্দ্রনাথের তিন পুত্র গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সম্পত্তির দেখাশোনার ভার দেবেন্দ্রনাথই করতেন এবং তাঁদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতেন। গণেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। নিঃসন্তান কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথর পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী আজীবন তাঁর ভরণপোষণের জন্য ঠাকুর এস্টেট থেকে মাসিক এক হাজার টাকা করে পেতেন। বিরাহিমপুরের যে জমিদারি-স্বত্ব দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন সেই সম্পত্তি সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ উইল করেন ১৮৯৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নির্দেশে এবং তাঁর হয়ে পূর্ববঙ্গের সম্পত্তির দেখাশোনা করছেন। এই উইল-মতো তাঁর তৃতীয়পুত্র হেমেন্দ্রনাথ, এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ তিনজনে মিলে একত্রে কুষ্ঠিয়া, বিরাহিমপুর ও রাজশাহির কালীগ্রাম পরগনার সম্পত্তির অধিকারী হন। রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের প্রকল্প মোটামুটি এই অঞ্চলেই সক্রিয় ছিল। ফলত গ্রমোন্নয়নে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার যেমন অসুবিধা ছিল, তেমনই জমিদার রবীন্দ্রনাথের একটি বৈষয়িক দায়ও ছিল— উইল অনুযায়ী ভূ-সম্পত্তির উপার্জন থেকে পরিবারের বিভিন্ন জনের জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থায়, ত্রিপুরাসুন্দরীর জন্য বরাদ্দ বাৎসরিক ১২,০০০ টাকা ছাড়া, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্য বাৎসরিক ১৫,০০০ টাকা, সোমেন্দ্রনাথ ২,৪০০ টাকা, ধীরেন্দ্রনাথ ১,২০০ টাকা, তাঁর স্ত্রী-র জন্য ১,২০০ টাকা এবং বীরেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ ও বলেন্দ্রনাথের পত্নী সাহানা দেবীর জন্য ১,২০০ টাকার বন্দোবস্ত ছিল। গ্রামোন্নয়নে যে রবীন্দ্রনাথ আলোচিত, তিনি মোটামুটি এই ব্যবস্থার মধ্যেই সক্রিয়। মোটামুটি তিরিশ বছর বয়সে এই দায়িত্বভারের সঙ্গে বাড়তি দায়িত্ব যা তাঁকে পালন করতে হতো, তা হলো গুণেন্দ্রনাথের এবং হেমেন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনা করে, তাঁদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া। এই বিশাল এজমালি সম্পত্তির দায়িত্ব দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছাক্রমে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন ১৮৯০ সালে, গোড়ায় পরিদর্শনের কাজ এবং ১৮৯৬ সালের ৮ আগস্ট পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব।

এরপরের ইতিবৃত্তে ১৯১২ সাল উল্লেখযোগ্য। এই বছরই রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড যাত্রা করেন এবং ইংল্যান্ডের পথে বোম্বাই থেকে জাহাজ ধরার জন্য রওনা হওয়ার আগে ২৪ মে ইজারাপাট্টায় স্বাক্ষর করলেন। ইজারাপাট্টার ফলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ৯৯৯ বছরের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রতি বছর ৪৫,০০০ টাকা প্রাপ্যের বিনিময়ে তাঁর অংশ লিখে দিলেন। এই বন্দোবস্তর ফলে সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ যৌথ ভাবে কালীগ্রাম ও বিরাহিমপুরের জমিদার হলেন। গিরীন্দ্রনাথের তরফে মৃত গুণেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী গগনেন্দ্রনাথ সমরেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই পেয়েছিলেন ইসবশাহীর জমিদারি। ইসবশাহীর কুঠি ছিল শাজাদপুরে। শাজাদপুর হস্তান্তরিত হলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শাজাদপুরের সম্পর্ক শেষ হয়। বিরাহিমপুরের কুঠি ছিল শিলাইদহে এবং কালীগ্রামের কুঠি ছিল পতিসরে। গোটা জমিদারি যখন এজমালি ছিল তখন রবীন্দ্রনাথ এই বিস্তীর্ণ জমিদারি দেখতেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাগাভাগিতে বিরাহিমপুর-শিলাইদহ পেলেন সুরেন্দ্রনাথ, এবং রবীন্দ্রনাথের ভাগে রইল পতিসর-কালীগ্রাম। অবশ্য, এই দুই পরগণার জমিদারিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের অংশ ছিল। এই শেষ ভাগাভাগির পরে শিলাইদহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রইল না। শিলাইদহের সম্পত্তি, প্রথমে দেনার দায়ে বন্ধক হিসেবে গচ্ছিত হয়, এবং পরে ঋণ অনাদায়ের ফলে তা চলে যায় ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদের কাছে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই, কালীগ্রাম পরগণার দেখাশোনা করার দায়িত্ব বর্তায় রথীন্দ্রনাথের উপর এবং ১৯৫২ সালের এক অর্ডিন্যান্স বলে তা চলে যায় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের কাছে। ছয় পুরুষের জমিদারীর এইখানেই ইতি। (তথ্যসূত্র : অমিতা চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, ১৪০২।)

আলোচ্য, অর্থাৎ ১৮৯০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়কাল ধরেই ভূ-সম্পত্তির ভাগাভাগি চলেছিল। বলাবাহুল্য পূর্ববঙ্গের ঠাকুর পরিবারের সম্পত্তির 'জমিদার' এবং গ্রামোন্নয়নে আগ্রহী

রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন ও একক কর্তৃত্ব তো ছিলই না, বরং মাসোহারা ও বিভিন্ন শরিকের স্বার্থ রক্ষার দায়ও তাঁর ওপর ছিল। এই প্রসঙ্গটি মনে করিয়ে দেয় প্রতিমা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি।

> ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েছে। দেনাশোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব চাষী প্রজাদের পরে যেন আর চাপাতে না হয়। একথা আমার অনেক দিনের পুরোন কথা। বহু কাল ধরেই আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারী যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারী হয়— আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক পোষাক দাবী করতে পারব কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম, জমিদারীর রথ সে রাস্তায় গেল না— তার পর যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল। এতে করে দুঃখ বোধ করেছি— কোনো কথা বলি নি। এবার যদি দেনা শেষ হয়, তা হলে আর একবার আমার বহু দিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করবো।

বাসনাগত ভাবে রবীন্দ্রনাথ যে সিদ্ধান্তে উপনীত তার সম্ভাব্য বাস্তবের একটা চেহারা দেখে এসে ১৯৩০ সালে রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন—

> যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি, এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী-ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।

এই একই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর *রায়তের কথা* বইয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

> আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে কোন যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্য্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্য্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতের মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায়, আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।

মানুষের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত আত্মপরিচিতি তাকে এক অনিবার্য জীবনের প্রতি সমর্পিত করে। এই জীবন তাকে যে সমাজ ও তার রীতির দ্বারা নিয়োজিত করে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্যোগ সেই মানুষের সেই সমাজের প্রতি সমালোচনা। সমাজের প্রচলিত সমাজনীতি এবং তার নৈতিকতাকে প্রশ্ন করার মধ্যে যে সচেতনতা প্রকাশ পায়, যা সমাজের ক্ষমতার কাঠামোকে পরিবর্তিত করতে উন্মুখ, সেই সচেতনতা রাজনৈতিক।

পারিবারিক দায় গ্রহণ করে জমিদারির দায়িত্ব নির্বাহী রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের সঙ্কল্পে যে সংকটে, তার একদিকে জমি থেকে খাজনা নিষ্কাশন ও তা শরিকদের মধ্যে বণ্টন এবং অন্যদিকে প্রজাদের স্বার্থরক্ষা। যে কোনো সচেতন মানুষের পক্ষে এ এক নৈতিক সংকটের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই সংকটের যে সমাধান খুঁজছিলেন তা হলো, নিজেকে এই সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সমস্যার অনুধাবন। সমস্যার যে সমাধানে তিনি উপনীত হয়েছিলেন, তার ব্যপ্তি কিছু সময়ের পরেই বিশেষ রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা নিয়ে সম্পত্তি ও কর নিষ্কাশনের আদিম উপায়ের পরিবর্ত খুঁজেছিল, রাশিয়ায়। সেই ব্যঞ্জনা আজও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তার অর্থ খুঁজছে, কৃষি জমির উপর কৃষকের অধিকারের প্রশ্নে, বনজ সম্পদের উপর বনবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে, অন্তজীবীদের খনিজ সম্পদের উপর অধিকারের প্রশ্নে।

রাষ্ট্রিক স্তরে উত্থাপিত সেই প্রশ্নের সন্ধান যে রাষ্ট্রনৈতিক সংকটের সম্ভাবনা তৈরি করেছে, তা ক্রমশ সারা বিশ্বকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করছে— জমি থেকে কর নিষ্কাশনের ক্ষমতাধারী এবং অক্ষম। এই সংকট যে অনিবার্য বিবাদের মীমাংসা চাইছে তা হলো— অক্ষমের ক্ষমতায়ন এবং সেই মীমাংসার ক্ষেত্র ঘিরেই গঠিত হচ্ছে এই সময়ের রাজনৈতিক উত্তাপ।

এই সংকটের দুইপ্রান্তেই লিপ্ত নামহীন কিন্তু ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত গোষ্ঠী। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে এই একই সংকটে-আবিষ্ট অবস্থানের বর্ণনা আগে উল্লেখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠির অংশ। নিয়তি নির্ধারিত আত্মপরিচয়ের বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষায় অন্তর্ঘাতী রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র জমিদারির দায় থেকে অব্যাহতি চাইলে বা সে দায় অন্যের উপর দিয়ে নিজে এই সংকটের নৈতিক সমস্যা থেকে ব্যক্তিগত ভাবে নিষ্কৃতি পেতেই পারতেন। আমাদের এই বিষয়ে আগ্রহের কারণ এই যে, তিনি সেইসব পন্থা গ্রহণ করছেন না এবং যা করতে চাইছেন তা হলো— **'কাজকেও কিছুদূর পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে তারপরে একেও আমার বিরুদ্ধে স্বাধীন করে দিতে পারলে তবেই এর জোর বাড়বে।'**

জমিদার হিসাবে নিয়তি নির্ধারিত পরিচিতির বিলুপ্তির জন্য, অন্য পক্ষের ক্ষমতায়নের এই প্রকল্প বেশ বিচিত্র শোনায়। এই প্রকল্প একাধারে, তাঁর ব্যক্তিপরিচয়কে বিলুপ্ত করে এবং অন্যধারে এক ভিন্ন পরিচয় দান করে যা তাঁর প্রাথমিক পরিচিতির ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি অন্তর্ঘাতে নিযুক্ত।

১৯০৮-০৯ সালে লিখিত একটি উপন্যাস, *গোরা*-র মূলচরিত্র আত্মপরিচিতির এই জাতীয় এক সংকটের সম্মুখীন। গোরা আজন্ম যে আত্মপরিচিতির দ্বারা পরিচিত, সেই পরিচিতিই তার ব্যক্তিত্বকে আকার দিয়েছে। সংকটের যে মুহূর্তে সে জানতে পারে যে, সেই পরিচিতি মিথ্যা, একটি বিরাট মিথ্যার দ্বারা রচিত সেই মুহূর্তটি তাকে এক আত্মপরিচিতির শূন্যতায় স্থাপিত করে। একাধারে গোরা, তার পূর্বতন পরিচিতিকেই গ্রহণ করতে পারতো, অন্যধারে সে সদ্য আবিষ্কৃত পরিচয়কেই গ্রহণ করতেই পারতো, অথচ লেখক তাকে এক নতুন এবং তৃতীয় পরিচয় দান করেছেন, যে পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচয়ের বিবাদের ক্ষেত্রটিকেই লুপ্ত করতে সক্রিয় ভাবে উদ্যোগী। *গোরা*-র লেখক রবীন্দ্রনাথকেও একই জীবনে বারবার আত্মপরিচিতির সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বারবার পূর্বপরিচয়ের বিলুপ্তির মধ্যে দিয়ে নতুন পরিচিতি ধারণ করতে হয়েছে। এই ক্ষেত্রে 'জমিদার' পরিচিতি থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার যে সংকল্প তারই একটা বয়ানের সন্ধান করা হচ্ছে। এই বয়ানে ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে, জমিদার পরিচিতিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এবং জমিদার পরিচিতিহীন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মরচিত বিবাদ এবং তা থেকে উত্থিত কবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি (হুমায়ুন আজাদের ভাবনা অনুযায়ী) সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন সামাজিক স্তর-ক্রমে বিন্যস্ত না হয়েই। □

যৌনকর্মী সহ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে. . .

ভারতী দে

আমাদের শীর্ষ আদালত (সুপ্রিম কোর্ট) ২০১১ জুলাই মাসে একটি কমিটি গঠন করে সারা দেশের যৌনকর্মীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। এই কমিটি, যারা পুনর্বাসন চান তাদের জন্য যেমন ব্যবস্থাপনার কথা বলবেন তেমনি যে-সব মহিলারা স্বেচ্ছায় যৌনপেশায় থাকতে চায় তাদের জন্য কাজের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে মহিলারা মর্যাদার সঙ্গে যৌনপেশায় থাকতে পারেন এই কমিটি সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা তৈরি করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেবেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই কমিটিতে যৌনকর্মীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশনামা কার্যত এদেশে যৌনকর্ম ও যৌনকর্মীদের নিয়ে যে শুচিবাই রয়েছে তা অনেকটাই ভেঙে দিয়েছে।

আদালত মোতাবেক যৌনকর্মীকে একজন নারী তথা এদেশের নাগরিক হিসেবে মান্য করার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যৌনকর্মীদের সংগঠন 'দুর্বার' যৌনকর্মীদের কাজের মর্যাদা ও অধিকারের দাবিতে বিগত আঠারো বছর লড়াই চালিয়ে আসছে। ক্রমশ এই লড়াইতে সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠন যুক্ত হয়েছে। এসবের ফল হিসেবে আজ যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে দেখার পক্ষে জনমানসে সুস্পষ্ট মতামত গড়ে উঠেছে, এ রাজ্যে তথা এদেশে। গত বছরের এক সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজ্যের শতকরা ৬০ শতাংশের বেশি জনপ্রতিনিধি আমাদের দাবিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছেন, যে দাবিগুলোর মূল বক্তব্য হলো যৌনকাজকে কাজ হিসেবে মেনে নেওয়া এবং যৌনকর্মীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদির বিধিব্যবস্থা গড়ে তোলা।

আজ এদেশে বহুজনই স্বীকার করছেন যে, এই পেশাটির সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের অপরাধী হিসেবে দেখাটা অন্যায় ও অযৌক্তিক। পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত কিছু মানুষজন অবশ্য যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ করতে এখনো বদ্ধপরিকর। তারা মহিলাদের জোর করে যৌনপেশা থেকে সরিয়ে এনে 'পুনর্বাসন' দেওয়ার সেই পুরোনো দাওয়াই ফাটা রেকর্ডের মতো বাজিয়ে চলেছেন। তারা এই পেশায় নিযুক্ত মহিলাদের বক্তব্যের ধার ধারেন না। তাদের এই 'দাদাগিরি' (নাকি বাবাগিরি?) কার্যত এই পেশায় যুক্ত নারীদের মৌলিক অধিকার হরণের রাস্তা তৈরি করে এবং পরোক্ষে পুলিশ ও প্রশাসনের লাগামছাড়া শোষণ ও অত্যাচারের সপক্ষে একধরণের ওকালতি মাত্র। আমরা আমাদের জীবন ও জীবিকা থেকে বুঝেছি তথাকথিত এইসব 'ভদ্রবাবুরা' আমাদের মুখ বন্ধ করতে এবং আমাদের জীবন ও পরিবারের বিষয়ে আমাদের কথা বলার অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিতে চায়। তারা আমাদের মতামতের তোয়াক্কা না করে নিজেদের বিশ্বাসমতে যৌনকর্মীদের ওপর ফরমান জারি করেন।

এ ভাবেই যুগ যুগ ধরে এই পেশায় যুক্ত নারীদের সমাজের মূল স্রোতের মানুষজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার সাবেকি কায়দা এখনও সমানতালে চলছে, এমনকি যখন যৌনকর্মীদের সংগঠন বৃহত্তম সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হন বা হতে চান তখনও এই সব তথাকথিত সমাজসেবীরা নানান ছুতোয় আমাদেরকে এক কোণে ঠেলে রাখার ফন্দি আঁটেন।

সবাই জানেন এদেশে যৌনকর্মীর সন্তানরা জন্ম থেকেই 'অচ্ছুত' ও 'পরিতাজ্য' হিসাবে সমাজে বেড়ে ওঠে। আমাদের সন্তানদের শিক্ষা বা কেরিয়ার তৈরি করার প্রধান বাধা এদেশের আইন এবং বিরূপ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই কঠিন বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে এদেশের একশ্রেণির মানুষ নৈতিকতার নামাবলী জড়িয়ে বিপ্লবী এবং মানবদরদী সাজার এক হাস্যকর প্রহসন আজও চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) যৌনপেশাকে কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। সপ্তাহ দুয়েক আগে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট সে দেশের সরকারের তৈরি 'যৌনকর্মী বিরোধী সরকারি নীতির' বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে যৌনকর্মীরা তাদের নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও অনুভবের আলোকে তাদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা রাজনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য তথা অধিকারহীনতা রুখতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

আজ আমরা পথে নেমেছি, এদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সমর্থনকে পাথেয় করে, আমরা মাঠে নেমেছি আমাদের চারপাশের আরও অসংখ্য সহমর্মী মানুষজনকে কাছে টেনে নিতে, এই মিছিলে তাদেরকে সামিল করতে।

আমরা এবং আমাদের পরিবারের মানুষজনেরা যাতে দেশের আর পাঁচটা নাগরিকের মতো সম্ভ্রম ও সুরক্ষা নিয়ে জীবনধারণ করতে পারে এবং তার জন্য যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা প্রয়োজন, আমরা তার দাবি রাখছি। আমাদের তথা অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষদের উপর চাপানো অযৌক্তিক আইন এবং পুলিশ প্রশাসনের জুলুমের অবসান ঘটানোও আমাদের এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

ইতিমধ্যে আমরা এদেশের অসংগঠিত শ্রমিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সবার জন্য সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে দেশজুড়ে নানান কার্যক্রমে সামিল হয়েছি। এ দেশের যৌনকর্মীদের সবভারতীয় নেটওয়ার্ক ৃজ্জজ্র্ঢ় তিন কোটি যৌনকর্মী ও তার পরিবারের মুখপাত্র হিসেবে নানান প্রোগ্রাম, আলোচনচক্র, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। আমাদের মূল বিষয়

□□ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) যৌনপেশাকে কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। সপ্তাহ দুয়েক আগে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট সে দেশের সরকারের তৈরি 'যৌনকর্মী বিরোধী সরকারি নীতির' বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে যৌনকর্মীরা তাদের নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও অনুভবের আলোকে তাদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা রাজনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য তথা অধিকারহীনতা রুখতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

হলো একজন যৌনকর্মী একধারে শ্রমজীবী মহিলা, অন্যদিকে পরিবারের কর্ত্রী, তিনি কারোর মা, কারোর বোন, বা মাসি। আমরা চাই একজন যৌনকর্মী তার নিজের পরিবারে তথা সমাজে এবং দেশে যে ভূমিকা রেখেছেন এবং রাখছেন তার মান্যতা ও স্বীকৃতি, আমরা চাই আমাদের কাজের উপযুক্ত সম্মান ও সামাজিক সুরক্ষা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, আমাদের দেশের সরকার বাহাদুর যে কটি স্বশাসিত সংস্থা বা মিশন (যেমন রুরাল লাইভলিহুড মিশন/নারী শক্তিকরণ মিশন/স্বাস্থ্য মিশন, ইত্যাদি) গড়েছেন, সেই সব মিশনে কর্তা-ব্যাক্তিদের সঙ্গে বিগত একবছর নানান আলাপ-আলোচনায় আমরা অংশগ্রহণ করেছি। এর মাধ্যমে মিশন কর্তৃপক্ষ একদিকে যৌনপেশাকে মেনে নিয়ে এই পেশায় যুক্ত মানুষদের ক্ষমতায়ন তথা উন্নয়নের সহায়ক ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে উদ্যোগী হচ্ছেন। তাদের এই বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও কর্তাব্যক্তি সহ আমরা দরবার করছি দেশের জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে। আজ আর আমরা একা নই, আমাদের পাশে রয়েছেন দেশের অগণিত অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের সংগঠন। আমরাও তাদের নানান আর্থিক ও সামাজিক লড়াইয়ে ভাগ নিচ্ছি, যুক্ত হয়েছি ।

এ দেশের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দাবি নিয়ে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী দেশের সমস্ত যৌনকর্মী আজ বিপিএল তালিকাভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাপনা যাতে সুষ্ঠু ভাবে গড়ে তোলা যায় তার জন্যও আদালত রায় দিয়েছেন।

আমরা ডাক দিচ্ছি আসুন, আপনারাও আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, এদেশে গড়ে উঠুক শ্রমজীবী মানুষদের শক্তিশালী জোট। আসুন আমরা সবাই একযোগে আওয়াজ তুলি যৌনকর্মীরাও এই সমাজের মানুষ, তাদের মানবিক এবং কাজের স্বীকৃতি ও অধিকার কায়েম হোক। জয়যুক্ত হোক মেহনতি মানুষের লড়াই, প্রতিষ্ঠিত হোক নারী সংহতি, সমস্ত নারীর ক্ষমতায়ন।

সারা পৃথিবীর সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন জয়যুক্ত হোক।

জয়ী হোক নারী আন্দোলন। □

দুর্বার প্রকাশনীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

অধিকার ভাবনা সম্পাদনা : **শুভেন্দু দাশগুপ্ত ও স্মরজিৎ জানা** দাম : ৮০ টাকা

নারী ভাবনার বাইশ কথা সম্পাদনা : **তরুণ বসু ও ভারতী দে** দাম : ১০০ টাকা

চেনা দেশ অচেনা মানুষ **স্মরজিৎ জানা** দাম ২০০ টাকা

ভিন্ন নারী অন্য স্বর **তরুণ বসু** দাম ৪০ টাকা

সমাজ সমস্যার সাতসতেরো **স্মরজিৎ জানা** দাম ১৯৫ টাকা

কখনও জিত কখনও হার সম্পাদনা : **স্মরজিৎ জানা, মৃণালকান্তি দত্ত** দাম : ৩০০ টাকা

ONLY RIGHTS CAN STOP THE WRONG Rs 50.00

BABUDER ANDAR MAHAL **Mrinal Kanti Datta** Rs 50

পাওয়া যাবে :

দুর্বার প্রকাশনী, ৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬-এ।

এ ছাড়াও কলেজ স্ট্রিটে দে বুক স্টোর, মণীষা গ্রন্থালয়।

মেদিনীপুরে ভুর্জপত্র। শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা। ও অন্যত্র।

সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ও জীবনদায়ী ওষুধ চাই

ওষুধ একটা পণ্য

ওষুধ একটা পণ্য, ওষুধ-কোম্পানি ওষুধ তৈরি করে মুনাফার জন্য।

কিন্তু অন্য পণ্যের সঙ্গে এ পণ্যের ফারাক হলো ক্রেতা (অর্থাৎ/রোগী) পণ্যটাকে পছন্দ করেন না। রোগীর হয়ে পণ্যটাকে পছন্দ করে দেন অন্য কেউ অর্থাৎ ডাক্তার।

ওষুধ একটা রাসায়নিক

যার ব্যবহার:

১. নিরাময়ে (যেমন— ব্যাক্টেরিয়া-সংক্রমণে অ্যান্টিবায়োটিক)।
২. রোগের কষ্ট কমানোর (যেমন— উচ্চ-রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস)।
৩. রোগ-প্রতিরোধে (যেমন— টিকাগুলো)।
৪. রোগ-নির্ণয়ে (যেমন— এক্স-রে বা সিটি স্ক্যানে অনেক ক্ষেত্রে রঞ্জকের ব্যবহার)।
৫. স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া পরিবর্তনে (যেমন— জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ওষুধ)।

সব ওষুধ কিন্তু দরকারি নয়

১৯৭৫-এ ভারতের এক সংসদীয় কমিটি বলেছিল ১১৭টা ওষুধ দিয়ে সে সময়ের ভারতের অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ অসুখের চিকিৎসা সম্ভব। ১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথম যে অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা বার করে তাতে ছিল ২০৮টা ওষুধ। অথচ সে সময়ে ভারতের ওষুধ বাজারে প্রায় ৬০ হাজার ওষুধ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় আছে ৩৭৪টা ওষুধ। ভারতের জাতীয় তালিকায় ওষুধের সংখ্যা ৩৪৮। অথচ ভারতের বাজারে ওষুধ ফর্মুলেশনের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়েছে।

এত ফর্মুলেশন তাহলে কেন? একই ওষুধ আলাদা আলাদা কোম্পানি বাজারজাত করে আলাদা আলাদা নামে। তারপর আছে একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ, যার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়। এছাড়া আছে অপ্রয়োজনীয় অনেক ফর্মুলেশন, যেমন— কাফ সিরাপ, হজমি ওষুধ, টনিক.....।

প্রচুর ওষুধ, মানুষের জন্য ওষুধ নেই....

আমাদের দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ওষুধ উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০০৯-২০১০ সালে ৬২,০৫৫ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি হয়েছে দেশের বাজারে আর ৪২,১৫২ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি হয়েছে।

উৎপাদিত ওষুধের আয়তনের হিসেবে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয়, মোট দামের হিসেবে পৃথিবীতে ১৪ নম্বর। এই ফারাকের কারণ হলো আমাদের দেশে ওষুধের দাম অনেক দেশের তুলনায় কম তাই মোট আয়তন বেশি হলেও মোট দাম কম।

এত উৎপাদক সত্ত্বেও অবশ্য আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক ওষুধ কিনতে পারেন না। চিকিৎসার মোট খরচের একটা বড়ো অংশ (৭০ থেকে ৮০ শতাংশ) জুড়ে থাকে ওষুধের দাম। চিকিৎসার খরচ জোগাতে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যায় রোগীর পরিবার।

ওষুধের মূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে

স্বাধীনতার ৩২ বছর পর ১৯৭৯-তেই প্রথম ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। সব ওষুধকে বিন্যস্ত করা হয় চারটে শ্রেণিতে এবং লাভের সীমা স্থির করে দেওয়া হয়।

ভাবা হয়েছিল, এই শ্রেণি বিভাগের ফলে জনসাধারণ জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ কম দামে পাবেন। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ওষুধ উৎপাদনে ওষুধ কোম্পানিগুলোর যে কম লাভ হবে তা তারা পুষিয়ে নেবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ওষুধ কোম্পানিগুলো জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ তৈরি কমিয়ে দিয়ে তৈরি করতে লাগল টনিক-কাশির সিরাপের মতো অপ্রয়োজনীয় ওষুধ। যক্ষ্মা-কুষ্ঠের ওষুধের মতো দরকারি ওষুধ অমিল হতে থাকল।

শ্রেণি	কি ধরণের ওষুধ	লাভের হার
১ম	জীবনদায়ী	৪০ শতাংশ
২য়	জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক	৫৫ শতাংশ
৩য়	অন্যান্য	১০০ শতাংশ
৪র্থ	নতুন ও বাকি সব ওষুধ	কোনো উর্ধ্বসীমা নেই

১৯৯০-এর দশকের শুরুতে শুরু হলো অর্থনীতির উদারীকরণ। শিল্পে লাইসেন্সিং প্রথা অবলুপ্ত হলো। ওষুধ শিল্প সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ অনুমোদিত হলো। কোন্ ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আনা হবে তা ঠিক করা হতে লাগল বাজারে ওষুধের মোট বিক্রিতে বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর অংশের ভিত্তিতে। এই জটিল হিসেবটা না বুঝে জেনে নেওয়া যাক, একটা তথ্য— বর্তমানে ৭৪টা ওষুধের কাঁচা মাল বা বাল্ক ড্রাগ এবং সেগুলো থেকে তৈরি ১৫৭৭টা ফর্মুলেশন মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায়।

সম্প্রতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশে এক বিশেষ মন্ত্রীগোষ্ঠী ২০১১-র অত্যাবশ্যক ওষুধের জাতীয় তালিকায় থাকা ৩৮৪টা ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু যে জটিল হিসেবে তাঁরা দাম নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে ওষুধের দাম কমার বদলে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

যোজনা কমিশনের সবার জন্য স্বাস্থ্য-বিষয়ক উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল কি বলছে

বিশেষজ্ঞ দল হিসেব করে দেখিয়েছেন স্বাস্থ্যখাতে খরচ জিডিপি-র ০.৫ শতাংশ বাড়ালেই সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো দেওয়া সম্ভব। তাঁদের মতে নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এমন হওয়া উচিত—

১. স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচের অন্তত ১৫ শতাংশ হোক ওষুধের জন্য, অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় থাকা ওষুধগুলো সরকারকেই কিনতে হবে।
২. আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ, হোমিওপ্যাথির আলাদা অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা করতে হবে, রাজ্যস্তরে তা কেন্দ্রীয় ভাবে কিনতে হবে।
৩ প্রামাণ্য চিকিৎসা-বিধি (Standard Treatment Guidelines) অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন ও ডিসপেন্সিং করতে হবে।
৪ স্বচ্ছ টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে ওষুধ কিনতে হবে।
৫ ভালো গুণমানের জেনেরিক ওষুধ নিশ্চিত করতে হবে।
৬ প্রত্যেক জেলায় গুদাম থাকবে।
৭ ওষুধ, টিকা ও পরিষ্কার সরঞ্জাম কেনার জন্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা চাই।
৮ ওষুধের গুণবত্তা পরীক্ষার ল্যাবরেটরি নথিভুক্ত করতে হবে।
৯ দ্রুত দাম মেটানোর ব্যবস্থা চাই।

তাঁদের মতে ওষুধ, টিকা ও কারিগরি নাগালে আনতে—

১ ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
২ জাতীয় ও রাজ্যস্তরে ওষুধ সরবরাহ কর্পোরেশন স্থাপন করতে হবে।
৩ ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে ক্ষমতা দিতে হবে।
৪ ফার্মাসিউটিক্যাল দপ্তরকে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে দেওয়া হোক।

সব ওষুধ তৈরি হোক জেনেরিক নামে

মানুষের নাগালে ওষুধকে আনতে হলে জেনেরিক নাম অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ছাড়া গতি নেই।

১ কেবল জেনেরিক নামই চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইপত্রে-পড়াশুনায় ব্যবহৃত হয়।
২ বাজারে একাধিক ওষুধের মিশ্রণে তৈরি প্রচুর ফর্মুলেশন পাওয়া যায়, যেগুলোর অধিকাংশই অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। জেনেরিক নাম ব্যবহার চালু হলে ওষুধ কোম্পানিগুলো বেশি সংখ্যায় একক ওষুধের ফর্মুলেশন উৎপাদন করতে বাধ্য হবে।
৩ ওষুধের নাম দেখেই সেটা কোন্ ধরণের ওষুধ বোঝা সহজ হবে। একই ওষুধের নানান ব্র্যান্ড নামে মিল থাকে না, ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এই বিভ্রান্তিও হবে না।
১ দেখা যায় জেনেরিক নামের ওষুধগুলোর দাম সাধারণ ভাবে সেই ওষুধেরই ব্র্যান্ডগুলোর চেয়ে অনেকটা কমদামী।
২ কেবল জেনেরিক নাম ব্যবহার করা হলে ডাক্তারদেরও অল্প কিছু নাম মনে রাখলেই হবে, একগাদা ব্র্যান্ড নাম মনে রাখতে হবে না।
৩ কেবল জেনেরিক নাম চললে ব্র্যান্ডের প্রচার-প্রসার করতে হবে না, খরচ কমবে, ওষুধের দামও কমবে।

ওষুধ-শিল্পে পুঁজির শোষণ বন্ধ হোক

হাথি কমিটি ১৯৭৫-এ প্রকাশিত রিপোর্টে সুপারিশ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র যেন ওষুধ উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। দেশীয় ওষুধ-কোম্পানিগুলোর বিকাশের জন্য কিছু ওষুধ উৎপাদন শুধু দেশীয় কোম্পানির জন্যই সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়। ওষুধ-শিল্পে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ভূমিকার নিন্দা করে কমিটি, ওষুধ কোম্পানিগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগের মাত্রা তৎক্ষণাৎ কমিয়ে ৪০ শতাংশ করা এবং তারপর কমিয়ে ২৬ শতাংশ করার কথা বলে, এমনকি বিদেশি ওষুধ কোম্পানিগুলোর জাতীয়করণের পক্ষে ছিল হাথি কমিটি। তা হয় নি, বরং বিদেশি বিনিয়োগ বাড়তেই থাকে।

আসুন আমরা দাবি তুলি হাথি কমিটির সুপারিশগুলো কার্যকর করার। □

দুর্বার ভাবনা

পাওয়া যাচ্ছে

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড) শিয়ালদহ স্টেশন (শানসাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়)

ক ল কা তা য় :

কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র) রাসবিহারী মোড়, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়)

ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে ব ই ক ল্প [দোতলায়]) বিধাননগর (উল্টোডাঙা) এবং

শিয়ালদহ-কল্যাণী শাখা ও শিয়ালদহ-বারাসাত শাখার বিভিন্ন রেল স্টেশনের বুকস্টলে ও অন্যত্র।

ক ল কা তা র বা ই রে

□ **পশ্চিম মেদিনীপুরে** ভূ র্জ প ত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড) □ **শান্তিনিকেতনে** সু ব র্ণ রে খা

□ **বাঁকুড়ায়** ধনঞ্জয় ব্যানার্জি, প্র য়া স ম ল্ল ভূ ম □ **মালদহে** অমিত দাস, পু স্প নি উ জ এ জে ন্সি

□ **কুচবিহারে** পার্থ লাহিড়ী, এইচ এন রোড □ **নবদ্বীপের** পোড়ামাতলায় সু জ য়া প্র কা শ নী □ **রায়গঞ্জে** ধা ন সিঁ ড়ি

যারা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান সরাসরি আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০ ০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০

মধুমেহতা

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

আমাদের অতি পরিচিত অসুখ ডায়াবেটিস। ডাক্তারি পরিভাষায় বা ভদ্র নাম হলো ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus)। বাংলা পরিভাষা মধুমেহ। এই মধুমেহ রোগে আক্রান্ত অথবা মধুমেহতায় ভুগছেন এমন মানুষের সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশি। পরিসংখ্যানবিদ্‌দের মতে ভারত বসে আছে ডায়াবেটিসের 'টাইম বোমা'র উপর। ২০৩০ সালে মোট রোগীর সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। আর পৃথিবীতে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ৭০ কোটি মানুষ এই রোগে ভুগবেন। সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা উন্নয়নশীল দেশ— যারা দশ শতাংশের কাছাকাছি বৃদ্ধির হারে (growth rate) পৌঁছোবার জন্য পশ্চিমী বিশ্বায়িত অর্থনীতির পথে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে, আরও আয় বাড়াতে চাইছে, জাপটে ধরছে নগরায়ণ- শপিংমল-মাল্টিপ্লেক্স-জ্যাঙ্কফুড-কোক-পেপসির সংস্কৃতিকে, বাড়ছে মানসিক চাপ, সেই সব জায়গাতেই— ডায়াবেটিস বাড়ছে হু হু করে। বিশ্বে অসুস্থতা ও মৃত্যুর এক প্রধান নাম ডায়াবেটিস যা আক্রমণ করে স্নায়ুতন্ত্র থেকে হৃৎপিণ্ড ও সংবহনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র থেকে চোখ, গায়ের চামড়া থেকে হাত পায়ের স্নায়ু ও পেশি— প্রতিটি প্রত্যঙ্গকেই। এক কথায় 'সব রোগের ধাত্রী' এই মধুমেহ নিয়েই আমাদের বর্তমান আলোচনা।

উৎসের সন্ধানে

মধুমেহতে কি হয়? মূল বিষয়টি অনেকেই জানেন। আমরা যত রকমের খাদ্য গ্রহণ করি শক্তির উৎস হিসাবে তা মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। শর্করা জাতীয় খাদ্য বা কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট এবং প্রোটিন। কার্বোহাইড্রেটের আবার নানা প্রকারভেদ। এক অণুবিশিষ্ট কার্বোহোইড্রেটকে বলে মোনেস্যাকারাইড— যার মধ্যে আছে গ্লুকোজ (প্রধানতম উপাদান), ফ্রাকটোজ (মূলত ফলে থাকে), গ্যালাকটোজ (মূলত দুধে থাকে) প্রভৃতি। দ্বি-অণু কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে (ডাই-স্যাকারাইড) পড়ে সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, মলটোজ ইত্যাদি। এর উপর আছে বহু অণুবিশিষ্ট শর্করা— উদ্ভিদদেহে স্টার্চ (নানা দানাশস্য, আলু ও মাটির তলায় ফসল ইত্যাদির মূল উপাদান) এবং প্রাণীদেহে গ্লাইকোজেন (যা মাংসপেশী ও যকৃতে জমা থাকে জরুরি প্রয়োজনের জন্য)। খাদ্যে যে রূপেই থাকুক না কেন, শরীরের মধ্যে সমস্ত শর্করা জাতীয় খাদ্যই শেষপর্যন্ত গ্লুকোজ (আণবিক ফর্মূলা $C_6H_{12}O_6$) পরিণত হয়। এমনকি অতিরিক্ত পরিমাণ স্নেহ ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যও (যার মূল উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড) থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয়। এই গ্লুকোজ জারিত হয়ে আমাদের শরীরের সমস্ত দৈনন্দিন কাজের শক্তির (energy) জোগান দেয়।

গ্লুকোজের পরিপাক ও আত্তীকরণের জন্য একান্তই প্রয়োজন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির এক ক্ষরিত রস বা হরমোনের— যার নাম ইনসুলিন। মানবদেহের পেটের মধ্যে একদম পেছনের দিকে আছে অগ্ন্যাশয় (Pancreas) বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ। এর সামনের অংশ থেকে নিঃসারিত হয় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট, পরিপাকের অতি প্রয়োজনীয় প্রায় ছয়রকম উৎসেচক (Enzyme), যা নালীপথে গ্রহণী (Dueodenum) -র মধ্যে এসে পড়ে। অগ্ন্যাশয়ের পিছনের অংশে থাকে নানা অন্তঃক্ষরা (Endocrine) গ্রন্থির সমষ্টি— এককথায় এদের নাম 'ল্যাঙ্গারহানের দ্বীপ'। এর মধ্যে আছে আলফা, বিটা, ডেল্টা প্রভৃতি কোষ। বিটা কোষ থেকে ক্ষরিত হয় ইনসুলিন নামক মহার্ঘ্য রাসায়নিক দ্রব্য— সরাসরি মিশে যায় রক্তস্রোতে। ইনসুলিন একটি দুই শৃঙ্খলবিশিষ্ট প্রোটিন যার গুরুত্ব শরীরে অপরিসীম। নানা দায়দায়িত্ব এই ইনসুলিনের— এককথায় বলা চলে, 'গুণতে গেলে গুণের নাহি শেষ।' তার মধ্যেও এই হরমোনের প্রধান কাজ হলো রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা, দেহকলা এবং কোষের মধ্যে রক্তের গ্লুকোজকে ঢুকতে সাহায্য করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করা ইত্যাদি। এক কথায় রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ যেন স্বাভাবিক মাত্রার থেকে বেশি না হয়ে যায় কেননা রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ তাহলে একদিকে সমস্ত ধমনী, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, চোখের রেটিনা, স্নায়ু সর্বত্র জমা পড়ে তাদের ধীরে ধীরে অকেজো করে তুলবে। অন্যদিকে শরীরের কোনো সংক্রমণই সহজে সারবে না। সংক্রমণকারী অণুজীবেরা পরম উল্লাসে রক্তের অত্যধিক মাত্রার গ্লুকোজ খেয়ে সানন্দে বংশবৃদ্ধি করবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, যদি শরীরে ইনসুলিনের অভাব ঘটে বা ইনসুলিন থাকা সত্ত্বেও ঠিকমতো কাজ না করে— তাহলে সমূহ বিপদ।

একদিকে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাবে, অন্যদিকে রক্তে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ থাকা সত্ত্বেও তা ইনসুলিনের অভাবে কোষে প্রবেশ করবে না। ফলে শক্তি ও খাদ্যের অভাবে শরীরের কোষ ও কলা ধুঁকে ধুঁকে মরবে। ঠিক সেই 'The Rhyme of a Ancient Mariner' কবিতার Water water everywhere,/Nor any drop to drink-এর মতো! ফলে নানা রোগ। অন্ধত্ব, হার্ট অ্যাটাক, কিডনি ফেলিওর, পক্ষাঘাত, হাতে বা পায়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত কিংবা ঘা, নানা ধরণের সংক্রমণ— এবং অবশেষে মৃত্যু! এই হলো মধুমেহ-র গোড়ার কথা।

কথা প্রসঙ্গে বলি ইনসুলিনের এক বৈমাত্রেয় ভাই আছে যা বের হয় পাশের 'আলফা' কোষ থেকে। স্বাভাবিক ভাবেই দাদার সঙ্গে তার জন্মশত্রুতা— মানে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক আর কি! তার নাম গ্লুকাগন। এই হরমোনের সব সময় চেষ্টা ইনসুলিনের বিরোধিতা করা, রক্তে চিনির

পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। ফলে অতিরিক্ত গ্লুকাগন ক্ষরণের ফলেও ডায়াবেটিস হতে পারে। এই গ্লুকাগনের পরম বন্ধু আবার কর্টিজল (Cortisol) বা গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন— যা বের হয় বৃক্কের উপর বসে থাকা অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স (Adrenal Cortex) নামক অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে। এরও সর্বদা চেষ্টা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেবার। ফলে একা ইনসুলিনকে লড়তে হয় এদের সবার সঙ্গেই। তবে ভাগ্য ভালো, ইনসুলিনের ক্ষমতা এদের চেয়ে অনেক বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইনসুলিনেরই জয় হয়। তবে মধুমেহতা আক্রান্ত রোগীদের কথা ভিন্ন।

মধুমেহ কত ধরণের

দেহে ইনসুলিনের অভাব ঘটে যদি অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। একে বলে প্রথম ধরণের (Type 1) বা ইনসুলিন নির্ভর (Insulin Dependent Diabetes Mellitus বা IDDM)। অনেকের মতে এটি একটি স্বপ্রতিরোধী (Autoimmune) রোগ যাতে শরীরের মধ্যেই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে বিটা কোষগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট কারণ জানা নেই। সাধারণত একদম কম বয়স থেকেই এই অসুখ দেখা যায় এবং বয়ঃসন্ধির সময় প্রবল ভাবে তা আত্মপ্রকাশ করে।

ইনসুলিনের অভাবে দেহে গ্লুকোজ বিপাকের বিপর্যয়ের ফলে তৈরি হয় 'কিটোঅ্যাসিড' নামক অত্যন্ত ক্ষতিকারক পদার্থ। ফলে রোগীটি অচৈতন্য হয়ে পড়তে পারে এবং সেই অবস্থাতেই হাতপাতালে আনলে হয়তো প্রথম বারের মতো ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। এই ধরণের রোগীদের সারা জীবনই ইনসুলিন নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

অপরপক্ষে প্রায় ৯০ শতাংশ ডায়াবেটিস রোগীর রোগ হলো ইনসুলিন অনির্ভর (Non-Isulin Dependent)। এদের শরীরে ইনসুলিনের ক্ষরণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকই হয়। কিন্তু কোষে যেসব ইনসুলিন গ্রাহক (receptor) থাকে, তাদের নানা গোলযোগের ফলে কোষ ও কলায় ইনসুলিন ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। ফলে রক্তে ওই হরমোন যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও, এমনকি বেশি থাকলেও কাজ লবডঙ্কা। স্থূলত্ব এর একটা কারণ। আরও নানা কারণ আছে। কী কারণে এই ধরণের মধুমেহ হয়, তার সমস্ত বিষয় এখনও পুরোপুরি বোঝা যায় নি। নীচের সারণিতে দু'ধরণের মধুমেহ-র পার্থক্য দেখানো হলো।

সা র ণি : ১

	প্রথম প্রকার (Type-1)	দ্বিতীয় প্রকার (Type-11)
১. প্রারম্ভ	আকস্মিক	ক্রমশ
২.আরম্ভের বয়স	শৈশব	বয়স্ক (সাধারণত ৪০ বছরের উপর)*
৩. রোগীর চেহারা	স্বাভাবিক বা কৃশকায়	সাধারণত স্থূলকায়।
৪. রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ	খুবই কম বা অনুপস্থিত	স্বাভাবিক, বেশি বা কেনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কম।
৫. কিটো অ্যাসিডোসিস	খুবই বেশি।	কম।
৬. জিনঘটিত কারণের সম্ভাবনা	খুবই বেশি।	কম। তবে এক্ষেত্রে পরিবারের অনেকের রোগ দেখা যায়
৭. রোগের প্রাদুর্ভাব	১০ শতাংশ	৯০ শতাংশ

* একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে। 'উন্নয়নশীল সমাজে' উন্নততর জীবনশৈলীর জন্য দ্বিতীয় ধরণের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার গড় বয়সও ক্রমে কমে আসছে। হামেশাই মধ্য বিশ/মধ্য ত্রিশের যুবক যুবতীদেরও মধুমেহ ধরা পড়ছে। এই ধরণের মধুমেহকে বলা হয় MODY (Maturity Onset Diabetes of Young)।

অন্যান্য ধরণের মধুমেহ

১. গর্ভকালীন মধুমেহ :

প্রায় ২ থেকে ৫ শতাংশ প্রসূতি মায়েদের গর্ভাবস্থায় গ্লুকোজের বিপাক এবং ইনসুলিন ক্ষরণের বা কার্যকারিতার ত্রুটির জন্য ডায়াবেটিস দেখা যায়। এর মধ্যে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে গর্ভ অবসানের পরও তা থেকে যেতে পারে এবং পুরোপুরি 'টাইপ টু' অসুখে পরিবর্তিত হতে পারে। বাকি ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই ধরণের গর্ভকালীন মধুমেহ অবশ্যই দ্রুত চিহ্নিত করে চিকিৎসা করতে হবে। নচেৎ গর্ভস্থ শিশুর নানা রোগ দেখা দিতে পারে। শিশুটির ওজন বেশি হয়। স্নায়ুতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র, মাংপেশীর রোগ হতে পারে। হৃৎপিণ্ডের নানা ত্রুটি দেখা দিতে পারে। জন্মের পর দীর্ঘদিন ধরে কামলা রোগ বা জন্ডিসে ভোগারও সম্ভাবনা থাকে।

২. অন্যান্য কারণে মধুমেহ (Secondary Diabetes) :

ক. **অগ্ন্যাশয়ের অসুখ** --- মূলত অত্যধিক মদ্যপানের ফলে অগ্ন্যাশয়ের দীর্ঘকালীন প্রদাহ (Chronic Pancreatities)। তাছাড়া যদি কোনো কারণে অগ্ন্যাশয় কেটে বাদ দিতে হয়।

খ. **অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অসুখ**—অতিরিক্ত গ্লুকাগন বা কর্টিজলের ক্ষরণ, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অতিরিক্ত ক্ষরণও রক্তে গ্লুকোজ বাড়ায়।

গ. **'ট্রেস' ডায়াবেটিস**—শরীরের অনেকটা অংশ পুড়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক, সারা শরীরে সংক্রমণ (Septicemia)।

ঘ. **ওষুধ**—স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ। ফ্যাট কমাবার 'স্ট্যাটিন' জাতীয় ওষুধ।

ঙ. **জন্মগত রোগ** --- যাতে শর্করা এবং স্নেহপদার্থের বিপাকে নানা গোলযোগ থাকে।

এছাড়াও আরও বহু কারণ আছে যার ফলে ডায়াবেটিস হতে পারে। কিছু ভাইরাল অসুখের ফলেও মধুমেহ হতে পারে, যেমন কক্সাকি (Coxasckie) ভাইরাস। Lattent Autodimmune Diabetes of Adult (LADA) আরও একটি অপ্রতুল অসুখ যাতে বয়স্ক মানুষদের টাইপ-১ ডায়াবেটিস হয়।

১৯৯৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর এক ধরণের মধুমেহকে চিহ্নিত করেছেন যার নাম 'অপুষ্টিজনিত মধুমেহ' (Malnutrition Related Diabetes Mellitus বা MRDM)।

রোগের উপসর্গ

মধুমেহ-র প্রধান উপসর্গ পাঁচটি—

১. অতিরিক্ত তৃষ্ণা
২. অতিরিক্ত ক্ষুধা
৩. অতিরিক্ত প্রস্রাব
৪. সারা শরীরে চুলকানি
৫. শরীরের কোনো অংশে অসাড়তা বা মাংসপেশীর দুর্বলতা।

এই ধরণের এক বা একাধিক উপসর্গ নিয়ে রোগী

চিকিৎসকের কাছে আসতে পারেন। তাছাড়া আরও নানা সমস্যা বা বিশেষ কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতাও প্রথমবার রোগীকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসতে পারে। মনে রাখতে হবে, বহুক্ষেত্রেই মধুমেহ নীরবে শরীরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, ক্রমশ বৃদ্ধি পায়— যতক্ষণ না চোখ, কিডনি, স্নায়ুতন্ত্র, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির কোনো না কোনো গুরুতর বৈকল্য ঘটে। তখন রক্ত পরীক্ষা করে ধরা পড়ে যে রোগী ডায়াবেটিসে ভুগছেন। বহুক্ষেত্রেই জীবনবিমার জন্য বা অন্য কারণে রুটিন রক্তপরীক্ষা করতে গিয়ে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। রোগীর অজান্তেই তখন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হয়তো পৌঁছেছে প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ৫০০/৬০০ মিলিগ্রাম।

অন্যান্য যেসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে

১. দুর্বলতা। কাজকর্ম করতে গিয়ে অল্পেই হাঁপিয়ে পড়া বা ক্লান্ত হয়ে পড়া।
২. শরীরে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসাড়তা (sensory loss) অথবা মাংসপেশীর বৈকল্য (motor loss)।
৩. কিডনির ক্ষতি হওয়ার জন্য হাত পা ফুলে যাওয়া, প্রস্রাব ঠিকমতো না হওয়া, রক্তাল্পতা এবং 'রেনাল ফেলিওর'-এর অন্যান্য উপসর্গ।
৪. চোখে অল্প বয়সে ছানিপড়া। দ্রুত চশমার 'পাওয়ার' পাল্টানো এবং ঝাপসা দেখা।
৫. গা বমির ভাব, বমি হওয়া, পেটে যন্ত্রণা।
৬. শরীর ভেঙে যাওয়া, দ্রুত শরীরের ওজন কমে যাওয়া।
৭. পায়ে সামান্য আঘাতের ফলে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া এবং সেই ঘা শুকোতে চায় না (Trophic ulcer)। পায়ে গ্রাংগ্রিন হতে পারে। এ ছাড়াও শরীরের যে কোনো জায়গায় কাটা-ছেঁড়া বা ক্ষত হলে তা শুকোতে দেরি হওয়া।
৮. ছেলেদের পুরুষত্বহীনতা। মেয়েদের বন্ধ্যাত্ব বা অনিয়মিত মাসিক।
৯. বারে বারে শ্বাসতন্ত্র বা ফুসফুস, রেচনতন্ত্র বা অন্যত্র সংক্রমণ। গায়ে বারে বারে ফোঁড়া হওয়া এবং চট করে অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ না হওয়া।
১০. রোগী প্রথমেই অর্ধচৈতন্য বা সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় আসতে পারেন। চিকিৎসার ফলে রক্তে শর্করা অস্বাভাবিক কমে গিয়ে (Hypoglycemia) অথবা চিকিৎসা না করার ফলে ভীষণ বেড়ে গিয়ে ((Ketoacidotic coma) এ রকম অবস্থা হতে পারে। তবে 'হাইপোগ্লাইসেমিক কোমা' অনেক বেশি প্রাণঘাতী। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের কোষের একমাত্র শক্তির উৎস গ্লুকোজ— যার অভাবে স্থায়ী বিকলতা বা মৃত্যু ঘটা সম্ভব।
১১. হার্ট অ্যাটাক (ডাক্তারি পরিভাষায় Myocardial Infraction) নিয়েও রোগী আসতে পারেন।

রোগ নির্ণয়

মধুমেহ নির্ণয় করতে গেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ মাপতে হবে। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। ব্রিটেনের ডাক্তারদের সঙ্গে আমেরিকার ডাক্তারদের মেলে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র সাথে মতবিরোধ আমেরিকার মধুমেহ সংগঠনের (American Diabetes Association)। মোটের উপর এখনও পর্যন্ত মধুমেহ নির্ণয়ের জন্য যে মানদণ্ড সর্বজনীন ভাবে গৃহীত তা নীচে দেওয়া হলো (প্রথমবার রোগ নির্ণয়ের জন্য)।

ক. সারারাত্রি উপবাসের পরে (অন্তত আট ঘণ্টা) শিরার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ— ১২৬ মিগ্রা/১০০ মিলি রক্তে—এর বেশি।
খ. ৭৫ গ্রাম (অথবা ১ গ্রাম/কেজি দেহের ওজনের) গ্লুকোজ খাবার দু'ঘণ্টা পরে শিরার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ— ২০০ মিগ্রা/১০০ মিলি রক্তে— এর বেশি।
গ. মধুমেহের একাধিক উপসর্গ আছে এবং যে কোনো সময়ে শিরার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ— (২০০ মিগ্রা/১০০ মিলি রক্তে)— এর বেশি।
ঘ. গ্লুকোজ যুক্ত হিমোগ্লোবিনা বা গ্লাইকোসাইলেটেড হিমগ্লোবিন (HbA_1C) র পরিমাণ ৬.৫ শতাংশের বেশি।

অনেকেই আবার গ্লাইকোসাইলেটেড হিমো-গ্লোবিনের মাত্রাকে বেশি গুরুত্ব দেন, কেননা এই মাত্রা অন্তত তিনমাস ধরে গড় রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল কিনা তার পরিচয় দেয়।

নীচের সারণি: ২-এ 'খ' গোষ্ঠীর মানুষদের ক্ষেত্রে পরামর্শ হলো শর্করা জাতীয় খাদ্য যথাসম্ভব কম খাওয়া, নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম করা এবং প্রতি ছ-মাস অন্তর রক্ত পরীক্ষা করানো। এঁদের মধ্যে অনেকেই কালক্রমে পুরোপুরি মধুমেহতায় আক্রান্ত হন। তখন তার চিকিৎসা করাতে হবে।

রক্তে শর্করার পরিমাণ ১৮০ মিগ্র/১০০ মিলি-তে ছাড়িয়ে গেলে তা প্রস্রাবেও বার হয় এবং পরীক্ষায় ধরা পড়ে। ডায়াবেটিসের রোগীরা এ পরীক্ষা নিজেদের বাড়িতে করেই কিছুটা ধারণা করতে পারেন। তবে তা কখনও রক্ত পরীক্ষার বিকল্প নয়। কেননা—

১. অনেক ক্ষেত্রেই রক্তে আরও কম মাত্রাতেই প্রস্রাবে গ্লুকোজ বের হয়ে আসে। একে বলে Renal Glycosuria। এটা কোনো অসুখ নয়।
২. দীর্ঘকালীন রোগের ফলে কিডনি জখম হলে, প্রস্রাবে গ্লুকোজ বের হওয়া কমে যায়। অনেক সময় রক্তে মাত্রা ২৫০ বা ৩০০ মিগ্রা হলেও প্রস্রাবে আসে না। তখন বরং প্রস্রাবে বেশি করে প্রোটিন বেরোতে থাকে যা মধুমেহ-র একটি বিপজ্জনক চিহ্ন।

এ-ছাড়া ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতি তিনমাস অন্তর HbA_1C পরীক্ষা করাতে পারলে ভালো। তবে

সা র ণি : ২

	উপবাসের পর রক্তে শর্করা	৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাবার পর রক্তে শর্করা	গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন (HbA_1C)
ক. মধুমেহ নেই	<১০০ মিগ্রা/ ১০০ মিলি	<১৪০ মিগ্রা/ ১০০ মিলি	<৬.০ শতাংশ
খ. গ্লুকোজের বিপাকে ত্রুটি আছে (Impired Glucose tolerance)	১০০-১২৫ মিগ্রা/ ১০০ মিলি	১৪০-২০০মিগ্রা/ ১০০ মিলি	৬.০ - ৬.৪ শতাংশ
গ. মধুমেহ	>১২৬ মিগ্রা/ ১০০ মিলি	>২০০ মিগ্রা/ ১০০ মিলি	>৬.৫ শতাংশ

পরীক্ষাটি করতে ৫০০-৬০০ টাকা লাগে। এ ছাড়াও বছরে অন্তত একবার লিপিড প্রোফাইল (কোলেস্টোরেল, ট্রাইগ্লিসেরাইড ইত্যাদি) এবং প্রতি ছয় মাসে একবার প্রস্রাবে 'মাইক্রোঅ্যালবুমিন' (Microalbumin) করাতে পারলে ভালো। তবে দু'টি পরীক্ষার খরচ হাজার টাকার বেশি পড়ে যায়।

আর দু'তিনটি কথা বলব। প্রথমত, বাড়িতে 'গ্লুকোমিটার' যন্ত্রে অনেকেই নিজেদের রক্ত পরীক্ষা (self monitoring) করেন এবং বুদ্ধিমান রোগীরা চিকিৎসকের নির্দেশমতো ঔষধের মাত্রা কিছুটা ইতরবিশেষ করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে গ্লুকোমিটারে যেহেতু শিরার বদলে কৈশিক ঝিল্লির (capillary) রক্ত ব্যবহৃত হচ্ছে, সে জন্য গ্লুকোজের পরিমাণ ১০-১৫ শতাংশ বেশি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যে সব রোগীরা ঔষধ খাচ্ছেন বা ইনসুলিন নিচ্ছেন তাঁরা তা চালু রেখেই রক্ত পরীক্ষা করবেন, ওষুধ বন্ধ করে নয়। এবং তাঁরা আর ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাবেন না। মধ্যাহ্নভোজে যে খাবারটা তাঁরা সচরাচর খান (ভাত বা রুটি) তাই খেয়েই দু'ঘণ্টা পরে রক্ত দেবেন।

তৃতীয়ত, মধ্যাহ্নভোজ খাবার ক্ষেত্রে ঠিক দু'ঘণ্টা কখন থেকে ধরা হবে? খাওয়া আরম্ভ করার সময় না শেষ করার সময়? এ বিষয়ে কোনো নির্দেশিকা নেই। আমার মতে মাঝামাঝি সময়টা ধরা যেতে পারে। এতে বিরাট তফাৎ হবার কথা নয়।

চতুর্থত, জ্বর অথবা অন্য কোনো সংক্রমণ থাকলে রক্ত পরীক্ষা করাবেন না। তাতে গ্লুকোজ বেশি আসতে পারে stress -এর জন্য।

চিকিৎসা

চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় এই প্রবন্ধে আমরা যাবো না। কেননা রোগীরা তো নিজেদের চিকিৎসা নিজেরা করবেন না। আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব জীবনশৈলীর পরিবর্তন বা Life Style Modification এর উপর।

দু'চার কথায় বলি, চিকিৎসায় যে সব ঔষধ ব্যবহার করা হয় তা মূলত দু'প্রকার।

মুখে খাবার বড়ি : বহু ধরণের বড়ি আছে, নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। সালফোনিলইউরিয়া, বাউগুয়ানাইড, পায়োগ্লিটাজোন, অ্যাকরাবোজ প্রভৃতি। এদের কাজের ধরণও ভিন্ন ভিন্ন। কারও কাজ শরীরে যে ইনসুলিন রয়েছে তার কর্মক্ষমতা বাড়ানো, কারও কাজ অন্ত্র থেকে গ্লুকোজের শোষণ কমানো। কোন্ ওষুধ কীভাবে ব্যবহৃত হয় সে বিস্তৃত আলোচনায় গিয়ে তথ্য ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই।

ইনসুলিন : ১৯২৩ সালে ফ্রেডরিক গ্রান্ট ব্যান্টিং ইনসুলিন আবিষ্কার এবং মানবদেহে ডায়াবেটিসের নিরাময়ে তার প্রয়োগ করে নোবেল পুরস্কার পান। এই ইনসুলিন বিশ্বের কোটি কোটি মধুমেহ আক্রান্ত মানুষকে নতুন জীবন দিয়েছে। প্রথমে গোরু বা শুয়োরের অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নিষ্কাশিত হতো। আজ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সফল প্রয়োগে 'হিউম্যান ইনসুলিন'-এর দাম নেমে এসেছে সাধ্যের মধ্যে। ইনসুলিনেরও বহু প্রকারভেদ। কতক্ষণ ধরে কর্মক্ষম থাকবে, কোন্ পদার্থের সঙ্গে মিশ্রণ করা হচ্ছে সেই সবের উপর ভিত্তি করে। রেগুলার, পি জেড আই, লেন্টি, মিক্সটার্ড প্রভৃতি। ইনসুলিন প্রোটিন বলে তা মুখে খাওয়া যায় না কারণ তাহলে পাকস্থলী ও অন্ত্রে ভেঙে যাবে। তাই চামড়ার তলায় ইঞ্জেকশন দিতে হয়। বিদেশে Continuous Infusion Pumpও পাওয়া যায়। বর্তমানে চেষ্টা চলছে নাকে স্প্রে হিসেবে ইনসুলিন দেবার। তাতে বারবার এবং প্রতিদিন ইঞ্জেকশন নেবার ঝক্কি কমে যাবে।

জীবনশৈলীর পরিবর্তন

আপনি মধুমেহ নিয়ে কি ভাবে দীর্ঘদিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রাসহ বাঁচবেন তা নির্ভর করছে আপনারই উপর। যত দিন যাচ্ছে তত অল্প বয়সীরা আক্রান্ত হচ্ছেন এই রোগে— জাতি, ধর্ম, বর্ণ এমনকি আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে। ডায়াবেটিস নিয়েও দীর্ঘদিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা এড়িয়ে বাঁচা যায় যদি আপনি নিজের জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত করেন। মনে রাখতে হবে, ডায়াবেটিস এক দীর্ঘকালীন, অ-নিরাময়যোগ্য রোগ। কিন্তু একে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সম্ভব ডায়াবেটিস নিয়েও সুস্থ ভাবে বাঁচা।

প্রাচীন মিশরীয় পুঁথিতে খৃস্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগেও ডায়াবেটিসের উল্লেখ আছে 'প্রচুর প্রস্রাব হয়' এমন অসুখ বলে। মধুমেহ নামের অর্থ 'সুমিষ্ট প্রস্রাব'। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকরা দেখেছিলেন এই ধরণের রোগীর প্রস্রাবে পিঁপড়ে ধরে যায়। গ্রিক ভিষগ অ্যাপোলোনিয়াস প্রথম 'ডায়াবেটিস' শব্দটি ব্যবহার করেন। রোমান ভিষগ গ্যালেনের বইতেও এর উল্লেখ অছে। ভারতে চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় (৪৪-৫০০ খ্রি.) পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে আজকের 'টাইপ-১' ও 'টাইপ-২' ডায়াবেটিস দুই ধরণের দুটি রোগ। একটি অল্প বয়সীদের হয়, অন্যটি স্থূলকায় পরিণত বয়সীদের। অতএব মধুমেহ-র ইতিহাসও যেমন বহু প্রাচীন, তেমনই তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও।

এই সংগ্রামে আপনার হাতিয়ার হলো :

১. **খ্যাদ্যাভাস :** শর্করা জাতীয় খাদ্য যথাসম্ভব বর্জন। বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনার বয়স, দৈহিক পরিশ্রম, দেহের ওজন ও উচ্চতা অনুসারে দৈনিক যত ক্যালোরি দরকার (১৮০০ থেকে ২০০০-এর মধ্যে) বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তার পরিমাপ করা এবং কঠোরভাবে তা মেনে চলা। মনে রাখতে হবে যে কোনো ক্যালোরিযুক্ত খাবারই অতিরিক্ত পরিমাণ খেলে তা শরীরের মধ্যে গ্লুকোজে পরিণত হবে। তাই দু'এক চামচ চিনি বা একটা সন্দেশ খাওয়া চলতেই পারে। কিন্তু মোট ক্যালোরির পরিমাণ কখনও বাড়ানো চলবে না। এর সঙ্গে বাদ দিতে হবে তেল, ঘি, ভাজাভুজি, জাঙ্ক ফুড, উচ্চকোটি সমাজের পিজা-পাসতা, বেকন, হ্যাম, সসেজ প্রভৃতিও। বাদ দিতে হবে তেল চুপচুপে বাঙালি খানা বা মোগলাই খানা।

২. **কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম :** অতিরিক্ত ক্যালোরিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রক্তে গ্লুকোজ কমাবার এক ভালো উপায় হচ্ছে দিনে অন্তত দুই থেকে চার কিলোমিটার জোরে জোরে হাঁটা, খালি হাতে ব্যায়াম করা, সাঁতার কাটা, জগিং করা, দৌড়োনো। 'ওয়াকার' জাতীয় যন্ত্রও ব্যবহার করা যেতে পারে। যাদের কাজকর্ম মূলত বসে বসে (Sedentary Work) তাদের অবশ্যই ব্যায়াম করতে হবে। সারাদিন গাড়িতে না চড়া, লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করা—এই সবও গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **ধূমপান ও মদ্যপান বর্জন করা।**

৪. **রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা।** অন্য ক্রনিক অসুখ থাকলে তার চিকিৎসা করা।

৫. **মানসিক চাপ** (stress) **কমানো** : মানসিক চাপ বাড়লে মধুমেহ রোগীদের রক্তে যে শর্করার পরিমাণ বাড়ে তা পরীক্ষিত সত্য। অতএব মানসিক চাপ কমাতেই হবে। বই পড়ে, গান শুনে,ধ্যান করে, যোগ অভ্যাস করে— যে যেভাবে মানসিক প্রশান্তি পান, তাই নিয়মিত ভাবে চর্চা করতে পারেন।

সংক্ষেপে এই হলো মধুমেহতার হালহকিকৎ। একটা সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করা গেল। এর পরেও রয়ে গেল বহু প্রশ্ন। ভবিষ্যতে কোনো প্রবন্ধে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
স্বাস্থ্যের বৃত্তে, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১২।

সোনি সোরি-র মুক্তির দাবিতে গণ-কনভেনশান

সোনি সোরি-র নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সোনি সোরি মুক্তি মোর্চা (১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬)-র পক্ষ থেকে গত ১৯ জুলাই ২০১৩ বিকেল ৪-০০-টেয় ভারত সভা হল্-এ (বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট ও চিত্তরঞ্জন এভেনিউ-এর সংযোগস্থলে) অনুষ্ঠিত হলো একটি গণ কনভেনশান। ওই দিনই দুপুর তিনটেয় কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মিলনে মুক্তি মোর্চার ডাকে আসা ছত্তীসগঢ়ের গান্ধীবাদী, পরিবেশ ও মানবাধিকার কর্মী হিমাংশুকুমার সোনি সোরি-র উপর পুলিস লকআপে অত্যাচারের বর্ণনা-সহ ছত্তীসগঢ়ের আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের কাহিনি শোনালেন। এই সাংবাদিক সম্মিলনে আরও উপস্থিত ছিলেন মাসুম-এর কিরীটি রায়, মুক্তি মোর্চার পক্ষে ড. স্মরজিৎ জানা, যুগ্ম-আহ্বায়ক ভারতী দে ও অন্যান্যরা।

ছত্তীসগঢ়ের আদিবাসী নারী সোনি সোরি-র মুক্তির দাবিতে বিকেল পাঁচটায় ভারত সভা হল্-এ অনুষ্ঠিত গণ-কনভেনশানে হিমাংশুকুমার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ছত্তীসগঢ় পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ-এর সাধারণ সচিব অজয় টিজি, জনদরদী চিকিৎসক বিনায়ক সেন, মুক্তি মোর্চার যুগ্ম-আহ্বায়ক পুণ্যব্রত গুণ ও ভারতী দে, দিল্লি থেকে উইলফ্রেড ডি কোস্টা-সহ কলকাতার বিভিন্ন পেশার বহু মানুষজন। এই গণ কনভেনশান উপলক্ষ্যে এটি প্রচারপত্রও প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছে :

'ছত্তীসগঢ়ের পুলিশ ও প্রশাসন দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে এক মহিলাকে অভিযুক্ত করেছেন এবং জেলবন্দি করেছেন। তিনি নাকি মাওবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের কাজকর্মে মদত জুগিয়ে আসছিলেন। মহিলার নাম সোনি সোরি। একে তিনি মহিলা, দ্বিতীয়ত জাতপাতের বিচারে তিনি আবার আদিবাসী। বলাবাহুল্য, তার কোনো বংশগরিমা নেই। পেশায় তিনি একজন শিক্ষক, পড়িয়ে থাকেন দান্তেওয়াড়ার জুবেলি অঞ্চলের একটা স্কুলে। তাকে গ্রেফতার করে জেলে পুরে রাখা কোনো আলোচনার বিষয়ই হতে পারে না। এদেশে আদিবাসী রমণীদের ক্ষেত্রে এসব ঘটনা তো আকচারই ঘটে থাকে।

'নকশালী আক্রমণ প্রতিহত করার নামে আর এক সন্ত্রাসের জন্ম দিচ্ছে দেশের গণতান্ত্রিক সরকার, এবং সেটা কতদূর জঘন্য হতে পারে তার নমুনা সোনি সোরির বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের সংগঠিত অত্যাচারের ঘটনার থেকে বুঝে উঠতে দেরি হবে না। আদিবাসী রমণী সোনি, যিনি তিনটি সন্তানের জননী, পুলিশ তাকে দিল্লি থেকে তুলে আনে ২০১১ সালের অক্টোবর মাসের ৪ তারিখে। ওই মাসের ১০ তারিখে তাঁকে যখন আদালতে তোলা হয় তখন শারীরিক ভাবে এতটাই অসুস্থ ছিলেন তিনি যে, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। তার উপর কি ধরণের শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছিল, তা ডাক্তারের রিপোর্টেও নথিবদ্ধ আছে। তার মাথার ডানদিকে ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ডাক্তারদের রিপোর্ট অনুযায়ী,কোনো ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করলে এরকম ক্ষতচিহ্ন তৈরি হয়। পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন শুধু অকথ্য পিটুনি, ইলেকট্রিক শক্ এক উর্ধ্বতন অফিসার, ওই অঞ্চলের পুলিশ সুপারিন্টডেন্ট, অঙ্কিত গর্গ, চরমতম বর্বর কাণ্ড ঘটিয়েছেন। কুখ্যাত ওই পুলিশ অফিসার তার আরও চার সহযোগী মিলে সোনিকে পুরোপুরি উলঙ্গ করে তার যৌনাঙ্গে এবং পায়ুতে একাধিক পাথর ঢুকিয়েছেন যার কারণে তিনি বর্তমানে প্রায় পঙ্গুর মতো জীবন-ধারণ করছেন।

'কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সোনিকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় দিল্লীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এ। সেখানে চারজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গঠিত কমিটি তার চিকিৎসার দায়িত্বভার নেন। দেড়মাস ধরে চিকিৎসা চালানোর পর ডাক্তাররা ওষুধপত্রের প্রেসক্রিপশন দিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি করে দিলে তাকে ফের পাঠানো হয় রায়পুরের জেলে, যা এখন সোনির স্থায়ী ঠিকানা। কিন্তু দিল্লি থেকে রায়পুর নিয়ে আসার রাস্তায় তার উপর একই ভাবে অত্যাচার চালিয়ে গেছে ছত্তীসগঢ়ের পুলিশ প্রশাসন। প্রায় না খাইয়ে, প্রচণ্ড গরমে অসংরক্ষিত একটি কামরায় প্রায় সারা রাস্তা দাঁড় করিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রায়পুরে।

'জেলের ভেতরেও সোনির সঙ্গে একই ধরণের কদর্য ব্যবহার করা হয়েছে। এইমস-এর ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ও পথ্যের কোনো ব্যবস্থাই জেল কর্তৃপক্ষ করেনি। অক্টোবর ২০১১-য় গ্রেফতারের পর থেকে এখনও সোনিকে জেলে বন্দি রাখা হয়েছে। রায়পুর জেলেও যৌন হয়রানির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্ট ৮ জানুয়ারি ২০১৩-য় জগদলপুর জেলে বদলির আদেশ দেয়। দেশ-বিদেশে পুলিশের এই মধ্যযুগীয় বর্বর কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হওয়ার ফলে মরীয়া হয়ে উঠেছে ওই রাজ্যের নীতি নিয়ন্ত্রকেরা। তারা যে করেই হোক সোনিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, সরাসরি তাকে মারতে গেলে আরও বেশি দুর্নামের ভাগী হতে হবে ভেবে, এখন এই নতুন কায়দায় তারা তিলে তিলে মেরে ফেলতে চাইছে সোনি সোরিকে। এতে যদি তাদের কুকর্মের বিষয়গুলো ধামাচাপা দেওয়া যায়।

' তবু এই মুহূর্তে আশার কথা শুধু এইটুকু যে, ১ মে ২০২৩ পর্যন্ত দান্তেওয়াড়ার আদালত সোনির বিরুদ্ধে আনা ৮টি অভিযোগের মধ্যে থেকে ৬টি খারিজ করে দিয়েছে। কারণ আদালতের কার্যত সেগুলো সাজানো মামলা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায়

নি। এই ঘটনার থেকে আরও একবার প্রমাণিত দয় যে ছত্তীসগঢ়ের পুলিশ কিভাবে হেনস্তা করছেন। বাকি দুটি মামলার একটি হলো এসার কোম্পানির থেকে টাকা তোলার অভিযোগ যা নাকি আসলে মাওবাদীদের কাজে ব্যবহৃত হবে বলে পুলিশ যুক্তি খাড়া করেছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, এসার কোম্পানিতে যুক্ত অপরাধীরা, যাদেরকে এই কেসের সঙ্গে জড়ানো আছে এবং এই কর্পোরেট হাউসের মাতব্বর, তারা সবাই জামিনে মুক্ত হয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সোনির ক্ষেত্রে জামিনের আবেদন গ্রাহ্যই করা হয়নি।

'সোনি মাওবাদী কিনা তা আমরা জানি না। জানা গেছে, তার বাবাকে মাওবাদীরা গুলি করে মারার চেষ্টা করেছিল কারণ তিনি নাকি মাওবাদীদের বিপক্ষে কাজ করেছিলেন। সোনির বাবা মারা না গেলেও মাওবাদীদের গুলিতে তার একটা পা জখম হয়ে যায়। সোনিকে ধরার আগেই পুলিশ সোনির ভাইপো লিঙ্গা কোড়্পি-র বিরুদ্ধে একই অভিযোগ খাড়া করে তাকে জেলবন্দি করেছে।

'আমরা জানি ছত্তীসগঢ়ে সরকার চালাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। কিন্তু অঙ্কিত গর্গ নামের যে পুলিশ অফিসার সোনির উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে তাকে অলংকৃত করতে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এবছর প্রজাতন্ত্র দিবসে মাওবাদী দমনে সাফল্য অর্জনের জন্য তাকেই বীরত্বের পদক দিয়েছে। এর থেকে বেশি ঘৃণ্য মানসিকতার চক্রান্ত হতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। সত্যিই আমরা আজ কোন্ দেশে বাস করছি? এই কি আমাদের গর্বের দেশ— স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী ভারত?! প্রগতি আর উন্নয়নের বড়াই করার আগে লজ্জায় কি আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায় না? এদেশের নাগরিক হিসেবে কোন্ মুখে এরপর আমরা আমাদের দেশের পরিচয় দেব?'

এই গণ-কনভেনশানে তিনটি প্রস্তাব নেওয়া হয় যা সর্বসম্মতিক্রমে সভায় পাশ হয়।

১. সোনি-কে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।
২. রাষ্ট্রপতির দেওয়া অঙ্কিত গর্গ-এর শৌর্যপদক এখনই ফেরত নিতে হবে।
৩. সোনির উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই আদিবাসী নারী সোনি সোরি-র মুক্তির দাবিতে মোর্চা অনেকদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র (কলেজ স্ট্রিট)

পাভলভ মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (মহাত্মা গান্ধী রোড) অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ) অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধান নগর পুরসভা)

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), হাওড়া ও শিয়ালদহ সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা (ডাকখরচ সহ। কলকাতার বাইরের চেকের জন্যে অতিরিক্ত ৩০ টাকা)।

পাঠক ও এজেন্ট রা যোগাযোগ করুন : ৯৮৩০ ৯২২১৯৪ বা ৯৩৩১ ০১২৫৩৭

একটি বিশেষ ঘোষণা

মে ২-১৩-য় দুর্বার ভাবনা পাঁচ বছরে পা দিল। অনেক অসুবিধার মধ্যেও আমরা চার বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমরা পত্রিকা প্রকাশ করে এসেছি। নিয়মিত গ্রাহক-পাঠকদের হাতে পত্রিকা তুলে দিয়ে এসেছি, এবং একই দামে। কিন্তু ঘটনা এই যে, গত চার বছরে ছাপার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বিপুল হারে বেড়েছে। এবার আমরা নিরুপায়। তাই বাধ্য হচ্ছি এই অগাস্ট ২০১৩ থেকে পত্রিকার দাম পাঁচ (৫.০০) টাকা বাড়াতে। অর্থাৎ এই সংখ্যা থেকে দুর্বার ভাবনার দাম হবে পনেরো (১৫.০০) টাকা। এই অগাস্ট ২০১৩-য় যাঁরা গ্রাহক হবেন তাদের বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হবে একশত পঞ্চাশ টাকা (যারা সরাসরি অফিস থেকে সংগ্রহ করবেন) এবং ডাক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে দুইশত (২০০.০০) টাকা। ইতিমধ্যেই যারা গ্রাহক আছেন তাঁদের কোনো বাড়তি মূল্য দিতে হবে না কিন্তু গ্রাহক পদ নবীকরণের সময় নতুন হারে গ্রাহক চাঁদা দিতে হবে।

সম্পাদক

দুর্বার ভাবনা